পয়সার ডায়েরী

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলসমূহের
জন্য প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে
অনুমোদিত

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পয়সার ডায়েরী

—ঃ❋ঃ

এক

জন্মের কথা কাহারও মনে থাকে না,—আমারও মনে নাই। কিন্তু শুনিয়াছি আমার জন্ম হইয়াছিল একটা আগ্নেয়গিরির মুখে!

আগ্নেয়গিরি—একটা অতি সাজ্ঘাতিক জিনিস। প্রকাণ্ড উচ্চ পর্ব্বত;—হঠাৎ একদিন তাহার মুখ ফাটিয়া যায় এবং তাহার ভিতর হইতে প্রবলবেগে নানা রকম ধাতু ও পাথর গলিয়া বাহির হইতে থাকে। সেই উত্তপ্ত পাথর ও ধাতুর স্রোত দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং বহুদূর পর্য্যন্ত—গ্রাম-নগর সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলে!

তখন আগ্নেয়গিরির উপর দিয়া পাখী উড়িতে পারে না। দৈবাৎ কোন পাখী তাহার চেষ্টা করিলে, সে মুহূর্ত্তের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। লোকজন, গরু-ঘোড়া—প্রাণপণে ছুটিয়াও তখন প্রাণ বাঁচাইতে পারে না। তখন যে যেই

অবস্থায় থাকে, ঠিক্ সেই অবস্থায়ই পাথর ও ধাতুস্রোতে ডুবিয়া যায় ; জীবন্ত সমাধির তীব্র মৃত্যুযন্ত্রণা তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

কবে কোন্ যুগে জানি না,—তেমনই কোন এক আগ্নেয়গিরির প্রবল ধাতুস্রোতের সঙ্গে গলিত তাম্রের আকারে আমি বাহির হইয়া আসি। সুতরাং আমি ঈশ্বরের সৃষ্ট অন্যান্য প্রাণীর মত রক্তমাংসের তৈয়ারী নহি,—আমার শরীর আগাগোড়া তামায় প্রস্তুত।—আগ্নেয়গিরির সেই গলিত তাম্র পরে ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া গেল,—আর তখনই বোধ হয় ঈশ্বরের বুকে আবার এক নূতন কল্পনা জাগিয়া উঠিল যে, তিনি সেই তাম্রপিণ্ড হইতে আমাকে ও আমার মত লক্ষ লক্ষ হতভাগাকে সৃষ্টি করিবেন !

পৃথিবীর একটা মহা আতঙ্ক, একটা সাঙ্ঘাতিক দৃশ্য আগ্নেয়গিরিতে যাহার জন্ম,—প্রচণ্ড উত্তাপে যাহার জীবনের প্রথম স্পন্দন,—যে হতভাগার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শত শত প্রাণী পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, বহু গ্রাম-নগর ধ্বংস হইয়াছে,—সে কি জীবনে কখনও সুখ-শান্তি পাইতে পারে ? —বোধ হয় সেইজন্য আমারও কোন শান্তি ছিল না।

আমার নিজের জীবনে কোন শান্তি থাকুক বা না থাকুক, —অপরকে শান্তি দিতে আমি সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলাম। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, অনেক স্থলে আমি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি। পকেটে 'পয়সা' থাকিলে অনেকেই

শান্তিতে দিন কাটাইয়াছে—ইহা আমি বেশ দেখিয়াছি। কিন্তু শক্তিই বা আমার কতটুকু?—তামার ছোট্ট একটি পয়সা আমি,—হাত নাই, পা নাই; ইচ্ছামত কিছু করিতে পারি না, ইচ্ছামত কোথাও যাইতে পারি না।

হাত-পা নাই বলিয়া কি আমাকে কম কষ্ট ভোগ করিতে হয়? কেহ স্নান করিতে আসিয়া আমাকে জলে ফেলিয়া গেল,—সেই ভাবেই রহিলাম তিন বৎসর! কেহ আমাকে পাইয়া ঘরে লইয়া গেল, বাক্সে বন্ধ করিল,—আবার গেল দুই বৎসর। তারপর একদিন হয়ত সে আমার বদলে বাজার হইতে কিছু কিনিয়া আনিল। কিন্তু আমি আবার বাক্স-বন্দী হইলাম। দৈবাৎ এক চোর বাক্স ভাঙ্গিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইল,—আমি দয়ালু চোরের হাতে মুক্তির আস্বাদ পাইলাম! আমার জীবন—সারাজীবন, কেবল এইরকম ইতিহাসেই ভরপুর।

* *

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অনেকে জানে। দলে দলে সিপাহী হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া ইংরেজদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। অসহায় স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ—কেহই তাহাদের হাতে নিস্তার পাইল না;—নিষ্ঠুরভাবে, পশুর মত তাহারা খুন-জখম করিয়া রক্তের স্রোতে দেশ ভাসাইল।

কিন্তু এত অত্যাচার, এত পাপ—চিরদিন সমানভাবে

চলিতে পারিল না। হঠাৎ চাকা ঘুরিয়া গেল। বিদ্রোহী সিপাহীরা প্রাণের ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

সেই সময় এক 'তেওয়ারী' সিপাহী বারাকপুর হইতে পলায়ন করিয়া আসামের জঙ্গলে উপস্থিত হইল। হতভাগা যেখানে গেল, সেখানেই পেছনে পেছনে ইংরেজের গোরা-সৈন্য ছুটিল। আসামে আসিয়াও সে রক্ষা পাইল না, গোরা-সৈন্যের গুলীতে আসামের জঙ্গলেই তাহার জীবনের অবসান হইল। কাজেই তেওয়ারী সিপাহী শৃগাল-কুকুরের খাদ্য হইয়া সেখানেই পড়িয়া রহিল।

মাত্র মাসখানেক আগে এক সাহেবের কুঠী লুট করিয়া তেওয়ারী অনেক টাকা-পয়সা সংগ্রহ করিয়াছিল। সেই হইতে তেওয়ারীর পকেটেই আমার স্থান হইয়াছিল।

বন্দুকের গুলীতে তেওয়ারী মরিয়া গেল,—সেইখানেই সে পড়িয়া রহিল, ধীরে ধীরে সেইখানেই সে পচিয়া গেল; আসামের মাটিতেই তাহার দেহের শেষ চিহ্নটুকু চিরদিনের জন্য মিশিয়া গেল।—কিন্তু রহিলাম শুধু আমি।

তখন তাহার জামা নাই, কাপড় নাই,—কোন পোষাক-পরিচ্ছদ নাই,—তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু আমি যত ক্ষুদ্র নগণ্য পয়সাই হই না কেন,—আমাকে ধ্বংস করে কাহার সাধ্য? আমি সেইখানেই পড়িয়া রহিলাম।

সেইখানে পড়িয়া থাকিয়া কত বাঘ দেখিয়াছি, কত বন্য হস্তী দেখিয়াছি, কত হিংস্র প্রাণী দেখিয়াছি! কালক্রমে সেই

স্থান একটা বিশাল চা-বাগানে পরিণত হইল; আমি সমস্তই দেখিলাম! কিন্তু আমার উদ্ধার হইল না।

অবশেষে বহু বৎসর পরে, এক কুলী-স্ত্রীলোক চা তুলিতে

আসামের চা-বাগানের কুলী রমণী

আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইল। তাহারা রোজ আট-দশ পয়সার জন্য কত পরিশ্রম করে। আমাকে পাইয়া তাহার কত আনন্দ!

দীর্ঘকাল পরে এমন একটি দরিদ্রের মুখে হাসি ফুটাইতে পারিয়া আমার জীবন সার্থক বোধ করিলাম।

ভাবিলাম, কুলী রমণীর কাছে কয়েক দিন বেশ সুখেই থাকা যাইবে। কিন্তু পারিলাম কই?—সেই চা-বাগানের কাজে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইলে কুলী ও কুলী-রমণীদিগের অনেক সময় পিঠের চামড়া ঠিক থাকিত না। সুতরাং কাজের পরিমাণ যাহাতে একটু কম হয়, তাহাদিগকে অত্যাচার বেশী ভোগ করিতে না হয়, সেই আশায় কেহ কেহ নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। শরীর অসুস্থ, বেশী পরিশ্রমের অনুপযুক্ত, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাহারা মাঝে মাঝে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়, এবং তাহার খানসামাকেও দু'একটি পয়সা দক্ষিণা দেয়। আমিও সেইভাবে ডাক্তার-বাবুর খানসামার পকেটে আশ্রয় লইলাম।

ইহার কয়েক দিন পরে আমি শিলংএর বাজারে এক দোকানীর হাতে পড়িলাম, খানসামা তাহার ডাক্তার-বাবুর অন্যান্য পয়সার সঙ্গে মিশাইয়া আমাকেও দোকানীর হাতে দিল এবং তাহার বদলে কয়েকখানা সাবান লইয়া গেল।

শিলং বাজারটি বেশ সুন্দর—পরিষ্কার, ফিট্‌ফাট্। মাত্র দশ মিনিট আমি সেই বাজারে ছিলাম, তাহার পরেই এক সাহেব খরিদ্দারের হাতে উপস্থিত হইলাম।

সেদিন রবিবার; সমস্ত আফিস বন্ধ। বৈকালে ৪টার সময় সাহেব তাহার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির

হইলেন। শিলংএর বাঙ্গালী বাবুরা সম্ভবতঃ তখনও তাস-পাশায় মত্ত বা নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। কিন্তু ইংরেজেরা সেই-ভাবে বৃথা সময় নষ্ট করেন না। তাঁহারা জীবনটাকে প্রকৃতই উপভোগ করেন।

শিলংএর 'এলিফ্যাণ্ট্ ফলস্' নামক জলপ্রপাতটি একটা দেখিবার জিনিস বটে। প্রচণ্ড শব্দে জল পড়িতেছে—জলের

শিলং বাজার

সূক্ষ্ম কণাগুলি বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিতেছে;—এ দৃশ্য যে দেখে নাই, তাহার শিলং-ভ্রমণ বৃথা!

সাহেবের কাছে দুই-তিন দিন বেশ সুখেই ছিলাম। কিন্তু তাহার পরে এমন এক সংসর্গে আসিয়া পড়িলাম যে, কোনও কারণে তাহা মনে হইলে আজও আমার সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠে। পেট্রো জীন্ পেজোন্নী (Signor Petro Jean

Pazonni) নামক এক ব্যক্তি শিলং সহরে তখন এক খেলা দেখাইয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার খেলা—এক অদ্ভুত খেলা! যে কোন সাপকে তিনি অতি সহজে ধরিয়া ফেলিতে
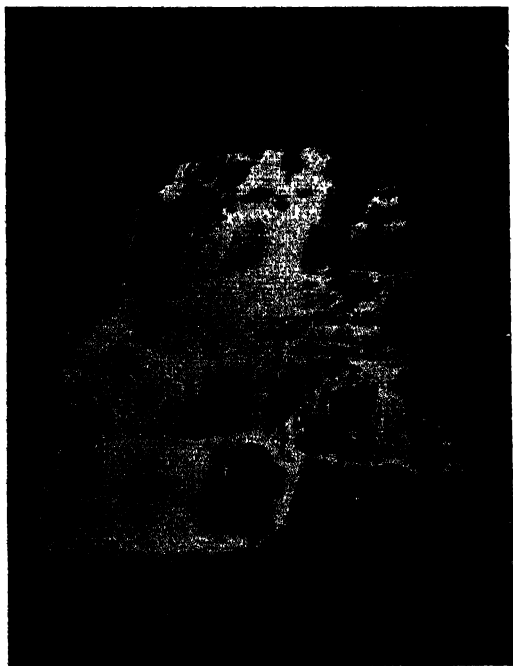
এলিফ্যাণ্ট্ জলপ্রপাত—শিলং

পারেন। তাঁহার দেহে কি যে অদ্ভুত জিনিস আছে জানি না। কিন্তু সাপের শত শত কামড়ও তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

কেবল তাহাই নহে, খেলা দেখান শেষ হইলে তিনি সাপের বিষদাঁতটি ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তাহার পর সাপটিকে আগাগোড়া চিবাইয়া খাইয়া ফেলেন !
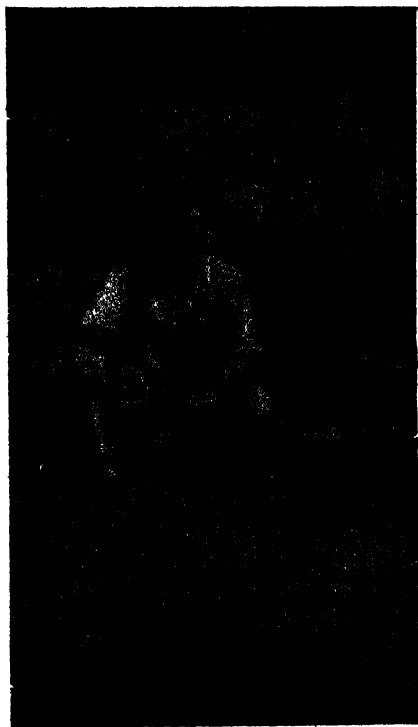
পেট্রো জীন্ একটা সাপ চিবাইয়া খাইতেছেন

মানুষের মধ্যে এমন কেহ থাকিতে পারে ইহা ধারণাই করিতে পারি নাই। তাঁহাকে অমন ভাবে সাপ ভক্ষণ করিতে

দেখিয়া কেহ কেহ ঘৃণায় বমি করিয়া ফেলিল! কিন্তু পেট্রো জীন্ অবিচল!—

সাহেব তাঁহার খেলা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং কতকগুলি সিকি-দুয়ানীর সঙ্গে আমাকেও তাঁহার হাতে বখ্‌শিস্ দিলেন।

পেট্রো জীন্ আমাকে তাঁহার পকেটে পুরিয়া রাখিলেন। তাঁহার হাতে তখনও সাপের গন্ধ! ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত আমাকে তাঁহার পকেটে আশ্রয় লইতে হইল।

দুই

সেই সাপ-খাদক সাহেবের পকেটে আমার অনেক দিন কাটিয়া গেল। আমি কেবলই পলায়নের সুবিধা খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার নিজের তো কোন হাত-পা নাই,—পলাইব কিরূপে? অথচ অমন লোকের পাল্লায় থাকিতে আমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। যাহোক্, অবশেষে একদিন সুযোগ জুটিয়া গেল।

সাহেবটি এক ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"বাবু, একখানি টিকেট দিন্।"

টিকেট-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথাকার টিকেট?"

সাহেব, কি একটা ষ্টেশনের নাম করিয়া একখানি দশ-টাকার নোট তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

টিকেট-বাবু একখানি টিকেট ও অবশিষ্ট টাকা এক জায়গায় গুছাইয়া রাখিয়া বলিলেন,—"স্যর! একটা পয়সা দিতে হবে।"

সাহেব বলিলেন,—"পয়সা তো নেই।"

ভিতর হইতে খোঁনাস্বরে অপর কে একজন কহিল,—"পয়সা নেই তো বাড়া যাও। টিকেট নিতে এসেছ কেন? যত সব—"

তাহাকে বাধা দিয়া টিকেট-বাবু একটু চাপাস্বরে কহিলেন,—"আঃ! কাকে কি বলছেন মশাই! দেখ্‌ছেন না, লোকটি একজন সাহেব! এখুনি রিপোর্ট কর্‌লে সর্ব্বনাশ হবে!"

"তাই নাকি!"—বলিয়া খোঁনাবাবুটি জানালার কাছে উঠিয়া আসিলেন এবং হাত যোড় করিয়া অতি বিনীতভাবে সাপ-খাদক সাহেবটিকে কহিলেন,—"আমায় ক্ষমা কর্‌বেন স্যর! আমি লোক চিন্‌তে পারি নি! আমি ভেবেছিলুম হয়ত কোন ভারতীয় বাবু। আমার দোষ নেবেন না স্যর।"

সাপ-খাদক সাহেবটি বাঙ্গালী বাবুদের এমন সাহেব-ভীতি দেখিয়া একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তবু যথাসাধ্য গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—"না, না,—কোন ভয় নেই তোমার। তা' যাক্,—দেখি, যদি দু'একটা পয়সা বেরোয়।"

তাঁহার মানিব্যাগের একটি কোণে আমি যে নিঃশব্দে পড়িয়া ছিলাম, সাহেবের বোধ হয় সে খেয়ালই ছিল না। যাহোক্ মানিব্যাগ খুলিতেই আমি গড়াইয়া তাঁহার হাতে

পড়িলাম। সাহেব আমাকে টিকেট-বাবুর হাতে সম্প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন। সাহেবের বোট্‌কা গন্ধ হইতে রক্ষা পাইয়া আমি আরামের নিঃশ্বাস ফেলিলাম।

খোঁনাবাবুটি তুই-তিনবার আমাকে বেশ করিয়া নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলেন। একবার একটু চাপাস্বরে কহিলেন,—"পয়সাটা বড় কালো হে! লোকটা খারাপ পয়সা দিয়ে গেল?"

"হ্যাঁ! পয়সা আবার খারাপ! যা' কাণ্ড আপনি ক'রে তুলেছিলেন, তা'তে কি আর পয়সা বাছাই করা চলে?"—বলিয়া টিকেট-বাবু আমাকে তাঁহার আলমারী'তে সাজাইয়া রাখিলেন।

পাঁচ মিনিটও গেল না, এক মাড়োয়ারী বাবু একখানা টিকেট্ কিনিতে আসিলেন; টিকেট-বাবু তাঁহাকে একখানা টিকেট দিলেন ও টিকেটের দাম ব্যতীত অবশিষ্ট টাকা-পয়সা গণিয়া ফেরৎ দিলেন। সেই সঙ্গে আমি মাড়োয়ারী বাবুটির থলিয়ায় আশ্রয় লইলাম।

মাড়োয়ারী বাবুর সঙ্গে কয়েকদিনের মধ্যেই আমি কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। কলিকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশন দেখিয়াই আমার চক্ষুঃস্থির! তারপর মাড়োয়ারীর সঙ্গে পথে বাহির হইয়া কলিকাতার শোভা-সমৃদ্ধি দেখিয়া আমি নির্ব্বাক হইয়া গেলাম।

আমার মনে পড়িল সেই বহু আগেকার কথা। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ ও তাহার পরক্ষণে যাহা যাহা

ঘটিয়াছিল, একে একে সমস্তই আমার মনে পড়িল। মনে পড়িল, কেমন করিয়া আমি এক বিদ্রোহী সিপাহীর হাতে পড়িয়াছিলাম,—কেমন করিয়া, প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে আমি এই কলিকাতা হইতেই পলায়ন করিয়া সেই বিদ্রোহী সিপাহীর সঙ্গে আসামের জঙ্গলে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম,—আজ তাহা ধীরে ধীরে সব মনে পড়িতে লাগিল। তারপর মনে পড়িল এক বীভৎস করুণ দৃশ্য—বন্দুকের গুলীতে বিদ্রোহী সিপাহীর মৃত্যু !

সেই সিপাহী নাই, সেই দিনও নাই। কলিকাতার সেই নগ্ন সৌন্দর্য্য নাই,—সারা ভারতে এখন আর তেমন প্রকাশ্য উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। কিন্তু আমি,—শতবর্ষাধিক বৃদ্ধ পয়সা, আজও অক্ষয় অমর হইয়া আছি ! বার্দ্ধক্যে আমার সৌন্দর্য্য লুপ্ত হইয়াছে, ক্রমাগত স্থান ও আশ্রয় পরিবর্ত্তনে, ক্রমাগত ঘর্ষণে আমি প্রায় মসৃণ হইয়া গিয়াছি,—তবু, মোটের উপর আমার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই ; আমার কর্ম্মশক্তি বা আমার মূল্যেরও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

মাড়োয়ারী বাবুর সঙ্গে ট্রামে চড়িয়া বহু স্থান দেখিলাম, অবশেষে একদিন দেখিলাম আলিপুর। আলিপুর এখন শোভা ও সমৃদ্ধির আবাসস্থল ; কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও আলিপুর বড় সুখের স্থান ছিল না, তখন সেখানে খুব বাঘের ভয় ছিল। শুনিয়াছি এক বাগানের মালী তাহার সাহেবের ছেলেমেয়ের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে,—হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা বাঘ আসিয়া

মালীর ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল! এমন ঘটনার কথা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দেও নাকি প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যাইত।

তাহারও কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা সহরের কোন অস্তিত্বই ছিল না। সম্রাট্ শাজাহান যখন দিল্লীর সম্রাট্, সেই সময় বৌটন্ নামে এক ইংরেজ ডাক্তার তাঁহার মেয়ের
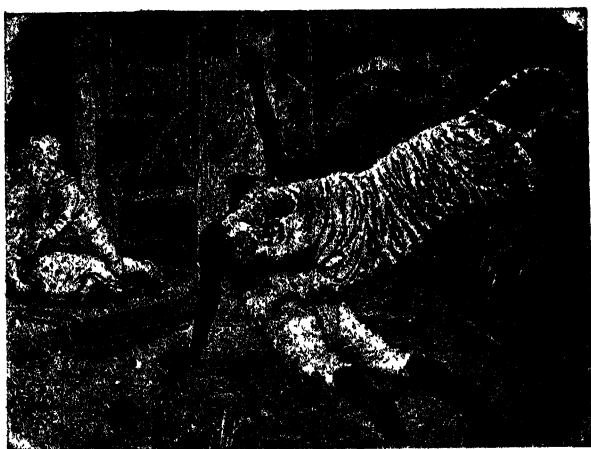
মালীর ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল

চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ডাক্তার বৌটনের চিকিৎসায় সম্রাট্-কুমারী ভাল হইয়া উঠিলেন। সম্রাট্ শাজাহান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ডাক্তারকে কহিলেন,—"ডাক্তার! তোমাকে আমি কি পুরস্কার দিব? কি পুরস্কার পেলে তুমি সন্তুষ্ট হও বল। আমার অসাধ্য না হলে আমি নিশ্চয়ই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করব।"

ডাক্তার বৌটন্ কহিলেন, - "সম্রাট্ ! আমাদের ইংরেজ বণিকেরা দু' দু'বার পর্ত্তুগীজদিগকে হারিয়ে দেওয়ায় আপনি আমাদের উপর অনেক দিন হ'তেই সন্তুষ্ট আছেন। আপনারই অনুগ্রহে আমাদের ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী আজ সুরাট্ আর মসলীপত্তনম্ বন্দরে কুঠী স্থাপন ক'রে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য কর্‌ছে। সম্রাটের অসীম দয়া। তবু সম্রাটের ইচ্ছায় ইংরেজ জাতির আরও অনেক উপকার হ'তে পারে।"

ডাক্তার বৌটনের কণ্ঠে অবশিষ্ট কথাগুলি আবদ্ধ হইয়া গেল। তিনি তাহা খুলিয়া বলিতে সাহস পাইলেন না।

সম্রাট্ কহিলেন,—"বল, ডাক্তার! তুমি নির্ভয়ে তোমার প্রার্থনার কথা খুলে বল।"

ডাক্তার কহিলেন,—"সম্রাট্ ! বাঙ্গালাদেশে হুগলীতে কুঠী স্থাপন ক'রে আমরা যেন বাঙ্গালীর সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য কর্‌তে পারি, আমি সম্রাটের কাছে সেই স্বাধীনতার জন্য আবেদন কর্‌ছি।"

সম্রাট্ শাজাহান তৎক্ষণাৎ তাহা মঞ্জুর করিলেন। তদবধি 'ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী'—ইংরেজ ব্যবসায়ীর দল,—সেইখানে ব্যবসায় করিতে লাগিল। কিন্তু কালক্রমে সম্রাটের প্রতিনিধি ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ তাহাতে বিরোধী হইয়া উঠিলেন। সুতরাং ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী মহাভাবনায় পড়িল।

জব চার্ণক্ নামে এক সাহেব ছিলেন তখন ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন প্রধান ব্যবসায়ী। ক্রমাগত রাজ-

কর্ম্মচারীদিগের সহিত লড়াই করিয়া হুগলীতে থাকা—তাঁহার ভাল বোধ হইল না। তিনি স্থান পরিবর্ত্তন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। অবশেষে একদিন দলবল লইয়া তিনি নৌকায় চাপিলেন। তাঁহাদের সমস্ত মালপত্রও নৌকায় বোঝাই করা হইল ; অনুকূল স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

পথে নদীর তীরে এক গ্রাম,—নাম 'সূতানুটি'। গ্রামটি দেখিয়া জব চার্ণকের বেশ পছন্দ হইল। নদীর ধারে—সুতরাং মালপত্র যাতায়াতের অসুবিধা নাই। নদীও গভীর,—কাজেই বড় বড় বোঝাই নৌকা চলাচল করিতেও কোন কষ্ট হইবে না।

জব চার্ণক্ সেই খানেই নৌকা লাগাইলেন, দলে দলে ইংরেজ বণিক্ তীরে উঠিতে লাগিলেন। সূতানুটি গ্রামেই তাঁহাদের কুঠী স্থাপিত হইল।

গ্রামবাসীরা হঠাৎ এতগুলি শ্বেতকায় লোকের আবির্ভাবে চমকিত হইয়া উঠিল। তখন ইংরেজদিগের পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল অনেকটা ভারতবাসীরই মত। ভারতবাসীর সঙ্গে ব্যবসায় করিতে আসিয়া ভারতবাসীর অনুকরণ করাই সঙ্গত,—ইহাই ছিল ইংরেজ বণিকের ব্যবসায়-বুদ্ধির আদেশ।

একটা লোক তাহার গরু-বাছুরের জন্য ঘাস লইয়া যাইতেছিল। অতগুলি ফর্সা লোক দেখিয়া সে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। জব চার্ণক্ তাহাকে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই গ্রামের নাম কি ?"

ঘাসওয়ালা কথাটি ভাল বুঝিল না। সে মনে করিল,

ঘাসগুলি কবে কাটা হইয়াছে, তাহাকে বুঝি তাহাই জিজ্ঞাসা

দলে দলে ইংরেজ বণিক্ তীরে উঠিতে লাগিলেন

করা হইতেছে। সে বলিল, "কাল কাটা" (কাল কেটেছি)।

জব চার্ণক্ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের নাম ঠিক্ করিয়া লইলেন 'কাল্কাটা'। 'কাল্কাটা' নামই বর্ত্তমান সময়ে 'কলিকাতা' নামে পরিণত হইয়াছে।

অদৃষ্টচক্রে মাড়োয়ারী বাবুটির হাত হইতে এক ডাক্তার, ও তাহার পরে কলেজের এক অধ্যাপকের হাতে পড়িয়া

গ্র্যাণ্ড হোটেল—১৭৮০ খৃষ্টাব্দে

আমি কলিকাতা সহরেই নানা স্থানে যাতায়াত করিতে লাগিলাম, এবং ঐ সময়ে কলিকাতা সহরের পূর্ব্ব-ইতিহাস কতকটা সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

অধ্যাপক মহাশয় একদিন গ্র্যাণ্ড হোটেলের এক সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। বুঝিলাম, উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ্য আছে। গ্র্যাণ্ড হোটেলের ঝক্ঝকে সাজসজ্জা এবং

খাদ্যের মনোরম গন্ধে শতাধিক বর্ষের বৃদ্ধ পয়সা আমি—আমারও প্রাণটা কেমন আনচান করিয়া উঠিল।

গ্র্যাণ্ড হোটেলের ইতিহাসও অতি পুরাতন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের গ্র্যাণ্ড হোটেলের অধ্যক্ষ আজ যদি ফিরিয়া আসিয়া বর্ত্তমান যুগের গ্র্যাণ্ড হোটেল দেখিবার সুযোগ পাইতেন, তবে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা থাকিত না, ইহা নিশ্চিত।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর অধ্যাপক মহাশয় যখন বাহির হইয়া আসিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। তিনি রাস্তার এক মোড়ে দাঁড়াইয়া গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং গাড়ীর অনুসন্ধানে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। হঠাৎ কোথা হইতে দুইটি কনষ্টেবল উদয় হইয়া কহিল,—"আপনি এখানে কি দেখ্‌ছেন? চলুন, আপনাকে থানায় যেতে হবে।"

অধ্যাপকের শত আপত্তি এবং শত যুক্তি হিন্দুস্থানী কনষ্টেবলদিগের নিকট ভাসিয়া গেল, সামান্য বেতনভোগী অশিক্ষিত কনষ্টেবলের কাছে উচ্চ বেতনভোগী সুশিক্ষিত অধ্যাপককে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। তাহাদের কঠোর আদেশ অমান্য করিতে তিনি সাহসী হইলেন না। নতমস্তকে অধ্যাপক তাহাদের সঙ্গে থানায় চলিলেন।

একটা অজানা আশঙ্কায় আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল।

তিন

সেদিন অধ্যাপক মহাশয়ের আর দুর্গতির সীমা ছিল না। নাম, ধাম ইত্যাদি শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থানার দারোগা বাবু তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন প্রায় রাত্রি একটার সময়। অত রাত্রিতে আর গাড়ী কোথায় পাইবেন? কাজেই তাঁহাকে হাঁটিয়াই যাইতে হইল। কিন্তু কিছুক্ষণ চলিবার পরেই তিনি আবার এক কনষ্টেবলের সম্মুখে পড়িলেন।

দাড়ী-গোঁফ-কামানো বেশ বলিষ্ঠ তরুণ যুবক অধ্যাপক মহাশয়কে দেখিয়া এই কনষ্টেবলেরও আবার কোন্ মনের ভাব জাগিয়া উঠিল। সে তাঁহার নিকট আসিয়া কহিল,—"বাবু! এত রাত্রে আপনি কোথা হতে আস্‌লেন? কোথায় যাবেন?—চলুন, আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।"

অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার রাত্রির ভ্রমণ-কাহিনী খুলিয়া বলিলেন এবং তিনি যে এতক্ষণ ধর্ম্মতলা থানার অতিথি ছিলেন, তাহা বলিতেও ভুল করিলেন না। কিন্তু কনষ্টেবল কেবল কর্কশকণ্ঠে কহিল,—"যাহোক্ সে সব বুঝা যাবে পরে। আগে চলুন থানায়।—হ্যাঃ! রাত দু'টোর সময় তিনি ধর্ম্মতলা থানা হতে বেড়িয়ে এলেন,—এই ব'লে আমাকে যেন বোকা বুঝিয়ে দিচ্ছেন!—চলুন, চলুন থানায়।"

বুদ্ধিমান কনষ্টেবলের কাছে অধ্যাপকের বক্তৃতা টিকিল

না। কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে আবার মুচিপাড়া থানায় যাইতে হইল।

থানার ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় অতি অমায়িক ও ভদ্র। তিনি ধর্ম্মতলা থানায় টেলিফোন্ করিয়া অধ্যাপকের কথা সত্য কিনা তাহা জানিয়া লইলেন। তারপর তাঁহাকে বৃথা কষ্ট দেওয়া হইল বলিয়া অতি বিনীতভাবে একটু ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিলেন।

অধ্যাপকের বক্তৃতার তোড়ে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, অনেক সময় পুলিশের দু'একটি কর্ম্মচারীর দোষে ভদ্রলোকদিগকে বৃথা কষ্ট পাইতে হয়। তথাপি সে-সব ব্যাপার যে কেবল কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইয়াই সঙ্ঘটিত হয়, পুলিশ যে জনসাধারণকে কিছুমাত্র বিদ্বেষের ভাবে দেখে না, ইহা বলিয়া তিনি উপসংহার করিলেন।

অধ্যাপক মহাশয় মুক্তিলাভ করিয়া যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, আসিবার সময় তাঁহাকে আর হাঁটিতে হয় নাই। থানার ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় কোথা হইতে একখানি ভাড়াটে' ঘোড়ার গাড়ী আনাইয়া দিলেন।

অধ্যাপক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গাড়ী কোথায় পেলেন?"

ইন্‌স্পেক্টর বাবু বলিলেন,—"আমাদের পুলিশের কিছুই অসাধ্য নেই।"

অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলেন। সারাপথে আমার মনেও প্রশ্ন হইতেছিল, বাস্তবিকই পুলিশের কি কিছুই অসাধ্য নাই? সম্ভবতঃ অধ্যাপক মহাশয়ও তাহাই ভাবিতেছিলেন। কারণ, পুলিশের অনুগ্রহে রাত্রি-ভ্রমণের ব্যাপারটা তাঁহার তখন পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই।

গাড়ী থামিলে অধ্যাপক মহাশয় ভাড়া কত জিজ্ঞাসা করিলেন। গাড়োয়ান কহিল,—"বারো আনা।"

তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়োয়ানকে বারো আনা গণিয়া দিলেন। কতকগুলি সিকি, দুয়ানী ও পয়সার সহিত আমিও গাড়োয়ানের হাতে যাইয়া পড়িলাম। সে আমাদিগকে ট্যাঁকে গুঁজিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

একটা অন্ধকার গলিতে স্যাঁৎসেঁতে খোলার ঘরের বাহির দিকে ছোট্ট একখানি বারান্দা। গাড়োয়ান যথাস্থানে তাহার গাড়ী ও ঘোড়া খুলিয়া রাখিল, তারপর ঐ বারান্দায় শুইয়া পড়িল—অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার নাক ডাকিতে লাগিল।

গাড়োয়ান ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমি তখনও অন্যমনস্কভাবে কত কি চিন্তা করিতেছিলাম। হঠাৎ মনে হইল, কে যেন দু'একবার আমার গায়ে হাত বুলাইয়া গেল!

অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিলাম একটা গাঁটকাটা চোর—পনের-ষোল বৎসরের ছোক্‌রা সেই গাড়োয়ানের ট্যাঁক্ হইতে পয়সা চুরি করিতেছে।

অদ্ভুত তাহার হাতের বাহাদুরী! ছোক্‌রাটি অতি সাবধানে

গাড়োয়ানের ট্যাঁক্ হইতে তাহার যথাসর্ব্বস্ব খুলিয়া লইল; তারপর সুড়্সুড়্ করিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।— গাঁটকাটা চোরের হাতে আমার স্বর্গলাভের ব্যবস্থা হইল!

ছোক্‌রাটি চোর,— পাকাচোর! আর অদ্ভুত তাহার বুদ্ধি! যেখানে একটু ভীড়, যেখানে দশজন লোক যাতায়াত করে,
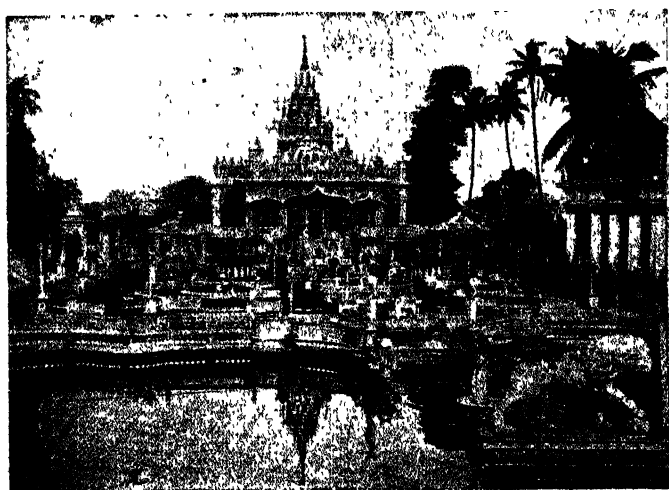
পরেশনাথের মন্দির

ছোক্‌রাটি সেইখানেই তাহার আড্ডা জমাইবার চেষ্টা করে। গাঁটকাটা চোরের সঙ্গেই আমার পুণ্যস্থান দর্শন হইল -- পরেশনাথের মন্দির।

বহু চেষ্টা করিয়াও ছোক্‌রাটি সেইখানে কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিল না। তারপর একবার যাদুঘর হইয়া চিড়িয়াখানা

বেড়াইয়া আসিল। কিন্তু সেখানেও কোন উপার্জ্জন হইল না। ফিরিবার পথে সে প্রথম গেল খিদিরপুর।—খিদিরপুর এখন লোকে ভরপুর। অনবরত গাড়ী-ঘোড়া, ট্রাম, বাস্ প্রভৃতির চলাচলে খিদিরপুর যেন গম্-গম্ করিতেছে!

খিদিরপুরের পুল—শতবর্ষ পূর্ব্বে

খিদিরপুরের পুল এখন একটি দেখিবার মত জিনিস। কিন্তু কিছু কম-বেশী কেবল একশত বৎসর পূর্ব্বেও খিদিরপুর একটি অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। সেই সময়ের পুল আর খিদিরপুরের বর্ত্তমান পুল,—এই দুইটিকে যদি পাশাপাশি সাজাইয়া রাখা

যাইত, তবে তাহাও একটা দেখিবার মত জিনিস হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমার আশ্রয়—সেই গাঁটকাটা চোরটি একবার খিদিরপুর বাজারে প্রবেশ করিয়া কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টা করিল। সেখানে ভীড় যথেষ্ট; কিন্তু কোন সুবিধা হইল না। বাজারের লোকগুলি যেন সবাই হাঁ করিয়া কেবল ঐ ছোকরার দিকে

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্

লক্ষ্য রাখিয়াছিল। সুতরাং সে কোন সুবিধা করিতে পারিল না। হতাশ হইয়া সে খিদিরপুর হইতে ফিরিয়া আসিল; তারপর ভাবিল, একবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্টা দেখিয়া আসি।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি রক্ষার

জন্য নির্ম্মিত। অগণিত অর্থব্যয় ও বিপুল পরিশ্রম করিয়া সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ারগণ ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন। কেহ কলিকাতায় আসিয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ না দেখিলে তাহার কলিকাতায় আসা বৃথা বলিয়াই বিবেচিত হয়।

ইহার নির্ম্মাণকার্য্যে নানা দেশের মূল্যবান্ মর্ম্মরপ্রস্তর ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন নবাব-বাদশাহদিগের চিত্র ও প্রাচীন যুগের নানা স্মৃতি-চিহ্ন অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে যে সকল ইংরেজ রাজপুরুষ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রস্তরমূর্ত্তি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

ছোক্‌রাটি সেখানেও কোন সুবিধা করিতে পারিল না। কারণ, তখন সেখানে অতি অল্প লোকজনই যাতায়াত করিতেছিল। সুতরাং সে কিছুক্ষণ সেখানে পাইচারী করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

তারপর একখানা 'বাসে' চড়িয়া ছোক্‌রাটি হাওড়াপুলের মোড়ে আসিয়া নামিল।

মানুষ তাহার বুদ্ধিবলে যে সকল অপরূপ জিনিস প্রস্তুত করিতেছে,—হাওড়ার পুল তাহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

হাওড়ার পুলে বার মাস সমান ভীড়। সেখানে পরস্পর পরস্পরের গায়ে না লাগিয়া কখনও চলা যায় না। সুতরাং উহা গাঁটকাটা, পকেটকাটার একটা তীর্থস্থান। কিন্তু খুব বাহাদুর লোক না হইলে বোধ হয় সেখানে চুরিশিল্পের সুবিধা

করিতে পারে না। কারণ, ভীড় খুব বেশী হইলেও হাওড়ার পুলের ভীড় অচল জমাট নহে,—তাহা সচল; একটা স্রোত তাহাতে লাগিয়াই আছে। সুতরাং সেই স্রোতে গা ঢালিয়া, যাত্রীর পায়ের তালে পা মিশাইয়া, অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুটির মত তাহার গা ঘেঁসিয়া চলিতে না পারিলে সেখানে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব।

ছোক্‌রাটি ঠিক্ তেমনই ভাবে একটি লোকের পাশে পাশে চলিতে লাগিল। লোকটি কলিকাতায় নূতন; লোকটির চাল-চলনে ছোক্‌রা তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। কাজেই সে অত লোকের মধ্যে ঐ লোকটাকেই বাছিয়া লইয়াছিল।

পুলের পূর্ব্বসীমা হইতে চলিয়া মাঝামাঝি আসিবার অবসরেই তাহার কাজ শেষ হইয়া গেল। ছোক্‌রাটি তাহার সঙ্গী লোকটির পকেট হইতে রুমালশুদ্ধ সমস্ত পয়সা তুলিয়া লইল,—তাহার কাণ্ডখানা দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম! কাজ শেষ হইয়া গেল;—ছোক্‌রাটি তখন একটু ধীরে হাঁটিয়া ইচ্ছা করিয়াই পেছনে হটিয়া গেল। হঠাৎ একটা হৈ-চৈ পড়িল,—এক ভদ্রলোকের পকেট মারিয়া লইয়াছে।

ছোক্‌রাটি তখন সেই ভদ্রলোকের নিকট হইতে মাত্র তিন হাত দূরে হইবে, তখনও বেশী দূরে সরিতে পারে নাই।—সে তাড়াতাড়ি রাস্তা অতিক্রম করিয়া পুলের উত্তর ফুটপাতে উঠিয়া পড়িল, তারপর বিপরীত স্রোতে গা মিশাইয়া আবার পূর্ব্বদিকেই চলিতে আরম্ভ করিল।

হাওড়ার পুলে তখনও খোঁজ খোঁজ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং গাঁটকাটা ছোক্‌রাটিরই অনুসন্ধান চলিতেছে। কারণ ঐ ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে ন্যাড়ামাথা একটা ছোক্‌রা অনেকক্ষণ যাবৎ পাশাপাশি চলিতেছিল।

পুলের নীচে একপাশে অনেকগুলি পশ্চিমদেশীয় নৌকা বাঁধা। ছোক্‌রাটি আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে সেইদিকে নামিল।

"ভাড়া যাবে?"—বলিয়া হাঁকিতেই এক নৌকা হইতে এক মাঝি বাহির হইয়া কহিল,—"কোথায় যাবে বাবু?"

ছোক্‌রাটি কহিল,—"দক্ষিণেশ্বর।"

"চল্‌ দক্ষিণেশ্বর"—বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড এক চড় ছোক্‌রার গালে পড়িল।

সে পড়ি-পড়ি করিয়া কোনরূপে নিজকে সামাল্‌ করিয়া লইল। তীব্র ক্রোধের সহিত মাথা ফিরাইয়া চাহিতেই দেখিল, প্রকাণ্ড লালপাগড়ী মাথায় এক পুলিশ তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

"চল্‌ দক্ষিণেশ্বর যাবি?"—বলিয়া পুলিশটি তাহার ঘাড় ধরিয়া হিড়্‌-হিড়্‌ করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

অনুসন্ধানে ছোক্‌রাটির নিকট হইতে রুমালশুদ্ধ সমস্ত টাকা-পয়সার উদ্ধার হইল। রুমালখানি সেই ভদ্রলোকটির বলিয়া সনাক্ত হইতেই দমাদ্দম্‌ কীল, চড় ও ঘুসি তাহার উপর পড়িতে লাগিল। তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, স্থানে স্থানে দু'একটু কাটিয়াও গেল। তবু একটু কাতর চীৎকার

তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল না! তাহার সহ্য করিবার শক্তি কি অদ্ভুত।

আমার বুকের মধ্যে একটা প্রশ্ন উঠিল,—এ গাঁটকাটা চোরগুলি কি প্রহার হজম করিবার শক্তিটা কোনরূপে শিখিয়া লয়? নতুবা, নিঃশব্দে এমন প্রহার হজম করা যে অসম্ভব। আমার মনে হইল, এমন নির্য্যাতন যাহারা সহ্য করিতে পারে তাহারা একটা রাজ্যও জয় করিতে পারে।—তাহারা একটা সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার যোগ্য ব্যক্তি।

চার

তাহার পরে অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে।

সেই গাঁটকাটা ছোক্‌রাটির আর কোন সংবাদ জানি না। সংবাদ না জানিলেও অনুমান করিয়া লইতে কোন কষ্ট হয় না। নিশ্চয়ই তাহার কোন শাস্তি হইয়া গিয়াছে। মালশুদ্ধ চোর ধরা পড়িল,—তাহার যদি কোন শাস্তি না হয়, তবে আর কাহার হইবে?

আজও মাঝে মাঝে আমার সেই কথা মনে হয়। হতভাগা ছোক্‌রাটা সেদিন কি মারটাই না হজম করিল! থানায় লইয়া যাইবার পরে তাহাকে যেন মশলা পিষিয়া ফেলিল; কিন্তু ছোক্‌রাটা বিশেষ কোন সাড়াশব্দই করিল না!

আমি মনে প্রাণে তাহাকে প্রশংসা না করিয়া পারি নাই। ছোক্‌রাটা বীর বটে!

ঘণ্টাখানেক 'উত্তম মধ্যম' হইবার পরে পুলিশগুলি হাঁফাইয়া পড়িল—কীল-ঘুসির স্রোত বন্ধ হইল।

গাঁটকাটা ছোক্‌রা যখন দেখিল যে, তাহার উপর আর কোন কসরৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, সে তখন ঘর্ম্মাক্তশরীরে ঘরের একটা কোণঠাসা হইয়া বসিল। কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া—অমন অলস অসাড় ভাবে থাকিয়া—বোধ করি সেও একটু বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই শরীর ও মনটাকে একটু চাঙ্গা করিয়া লইবার জন্য কাপড়ের কোণ হইতে দুইটি পয়সা বাহির করিয়া একজন কনষ্টেবলকে কহিল,—"জমাদার সাহেব! একটা বিড়ী আনিয়ে দিবেন?"

'জমাদার সাহেব' নামটির মধ্যে বোধ হয় কোন মাদকতা আছে। কনষ্টেবলদিগের কানে তাহা কোন্ মধু ঢালিয়া দেয় জানি না,—অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে তাহাই হইল। কনষ্টেবলটি একগাল হাসিয়া পয়সা দুইটি লইয়া বাহিরে গেল এবং একটু পরেই তিন-চারিটি বিড়ী আনিয়া ছোক্‌রাকে দিল।

দুই পয়সার বিনিময়ে মাত্র তিন-চারিটি বিড়ী হয়ত অনেকেই বরদাস্ত করে না। কিন্তু ধুরন্ধর ছোক্‌রা সম্ভবতঃ কোন্ দেবতার কি মন্ত্র, তাহা বেশ বুঝিত। সে বোধ হয় স্থির করিয়াছিল যে, চুরিকরা পয়সাতে যদি একটু দান-খয়রাৎ করা যায়, অথবা একটু উদারতা দেখান যায়, তবে তাহাতে ক্ষতি কি

আছে ? বিশেষতঃ নিজে যখন অসহায়, তখন একটু কৌশল দেখান ভাল।

আমার মনে হইল, ছোক্‌রাটি গুণী,—অসাধারণ গুণী। বুদ্ধিমান্ মন্ত্রীর আসনে বসিতে পারিলে এইরকম ছোক্‌রাই কালে একটা রাজ্য চালাইতে পারিত,—ইতিহাসে ইহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিত। ছোক্‌রাটি বসিয়া বসিয়া বেশ আরামে বিড়ী খাইতে লাগিল, কিন্তু আমি তখন 'জমাদার সাহেবের' ট্যাঁকে আশ্রয় লইয়াছি।

বেশীক্ষণ সেখানে থাকিতে হইল না। জমাদার সাহেবের নিকট হইতে প্রথমে পৌঁছিলাম এক গাঁজার দোকানে। তারপর সেখান হইতে তখনই গাঁজা-ভক্ত অপর এক খরিদ্দারের ফিরৃতি পয়সার সঙ্গে তাহার কাছার খুঁটে আশ্রয় লইলাম।

গাঁজা-ভক্ত লোকটি উড়িষ্যাবাসী। সেদিনই রাত্রির গাড়ীতে সে তাহার নিজের দেশে যাত্রা করিল। বেচারা অনেক দিন পুরীর রথে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ পায় নাই। এবার ঠিক্ করিয়াছিল, সে রথ দেখিবেই।

একবার আশঙ্কা হইল হাওড়া ষ্টেশনে টিকেট কিনিবার সময় সে হয়ত অন্যান্য টাকা-পয়সার সঙ্গে আমাকে ষ্টেশনেই রাখিয়া যাইবে। কিন্তু অদৃষ্ট আমার ভাল, সে আমাকে দিয়া টিকেট কিনিল না, তাহার কোচার এক খুঁট হইতে গোটা কয়েক টাকা বাহির করিয়া তাহাতে টিকেট কিনিয়া লইল,—আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলাম। দেখিলাম, লোকটি অশিক্ষিত

হইলেও অতি সাবধান। কাপড়ের চারিটি কোণায়ই তাহার টাকা-পয়সা বাঁধা!—সে তাহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই; তাহার পান রাখিবার 'বঁটুয়া'র ভিতরে, গামছার এক কোণে এবং গায়ের কোটের ভিতরদিকে সেলাই-করা এক থলিয়াতে,—সহস্র জায়গায় তাহার পয়সা-কড়ি সুরক্ষিত আছে!

সে হয়ত মনে করিয়াছে—গাঁটকাটা, চোর, বদমায়েস কত চুরি করিবে? দু'এক জায়গায় চুরি হইলেও আরও পঞ্চাশ জায়গায় তাহার সম্বল থাকিয়া যাইবে, সে নিঃসম্বল হইবে না।

ভারতবর্ষে এরকম সাবধান লোকের সংখ্যা যদি অধিক হয়, তবে গাঁটকাটা জাতীয় চোরগুলি না খাইয়া মরিবে—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"কতকগুলি লোকের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য—তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য,—যদি অপর কতকগুলি লোককে মারিয়া ফেলিতে হয়, তাহা আইন ও ধর্ম্মসঙ্গত হইবে কি?—কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবার সমস্যা বলিয়া মনে হইল।

জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন লোকটি সর্ব্বপ্রথমে 'চন্দন-তালাও' বা চন্দন-সরোবরে স্নান করিল। 'চন্দন-তালাও' অতি পবিত্র জলাশয়। পুরীতে আসিয়া প্রায় সকলেই এখানে অতিশয় ভক্তির সহিত অবগাহন স্নান করেন। স্নানের পরে সংস্কৃত স্তোত্রের অবিকৃত ও বিকৃত উচ্চারণে জলাশয় ও তাহার তীরভূমি মুখরিত হইয়া উঠে।

স্নানান্তে সে এক পাণ্ডাকে দিয়া বেশ করিয়া ফোঁটা-তিলক

কাটাইয়া লইল। তাহার পরে পুরীর লোকনাথ-মন্দিরে দেবদর্শন করিল। দীর্ঘকাল পরে দেবদর্শন। তাহা কি খালি হাতে করা যায়? সে কোচার খুঁট হইতে একটি পয়সা বাহির করিয়া ভক্তিভরে তাহা দেবতার চরণে প্রদান করিল।

'চন্দন-তালাও'

তাহার ভক্তির আতিশয্যে মনে হইল, দেবতা তাহা গ্রহণ করিলেন।

জগন্নাথদেবের মন্দিরও ততক্ষণে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দলে দলে লোক তাহাতে যাতায়াত করিতেছিল। লোকটি "জয় জগন্নাথ!" বলিতে বলিতে গভীর ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকাইয়া ভক্ত তাহার জামার ভিতরদিকের সেলাই-করা পকেট হইতে

একটি চক্‌চকে টাকা বাহির করিয়া দেবতার চরণে নিবেদন করিল। টাকার শব্দে সকলেরই দৃষ্টি তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। এক দেবতার অদৃষ্টে পয়সা, অপর দেবতার অদৃষ্টে টাকা,—এই পার্থক্যের কি যুক্তি আছে আমি তাহা আজিও বুঝিতে পারি নাই।

সে মন্দির হইতে বাহিরে আসিবামাত্র চারিদিক্ হইতে

লোকনাথ-মন্দির

দলে দলে ভিক্ষুক আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং "দে বাবা, ভিক্ষা দে ; দে বাবা, একটা পয়সা, দে বাবা, একটা আধ্‌লা দে"—বলিতে বলিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কোন কোন দুঃসাহসী ভিখারী ছোক্‌রা তাহার কাছা-কোচা ধরিয়াও টানিতে লাগিল। আমার ভয় হইল, কাছার খুঁট হইতে যদি আমি খুলিয়া পড়ি তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ !

জগন্নাথদেবের মন্দির

উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া লোকটি তাহার কাছার এক কোণায় হাত দিল,—আমি শিহরিয়া উঠিলাম। কিন্তু সে আমার মনোভাবের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া একটি পয়সা খুলিয়া সেই ভিখারী ছোক্‌রাকে দান করিল।

আমার অদৃষ্ট মন্দ। নতুবা সেখানে আরও অনেক পয়সা

জগন্নাথদেবের রথ

থাকিতে সে আমাকেই টানিয়া বাহির করিবে কেন? আমি তখন ভিখারী ছোক্‌রার হাতে যাইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, জীবনটা বোধ হয় আবার এক নূতনপথে পরিচালিত হইবে।

জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ততক্ষণে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অগণিত মনুষ্য-মস্তক যেন একটা অনন্তবিস্তৃত কৃষ্ণবর্ণ সমুদ্রের

সৃষ্টি করিয়াছিল। ভীষণ কলরব,—সেই কলরব সমুদ্রগর্জ্জনের মতই গম্ভীর ও অবিশ্রান্ত।

ভিখারী ছোক্‌রা এক পয়সায় মহা আনন্দে আত্মহারা হইয়া রথযাত্রার দিকে ছুটিয়া গেল। জনবাহিনীর সঙ্ঘর্ষণে
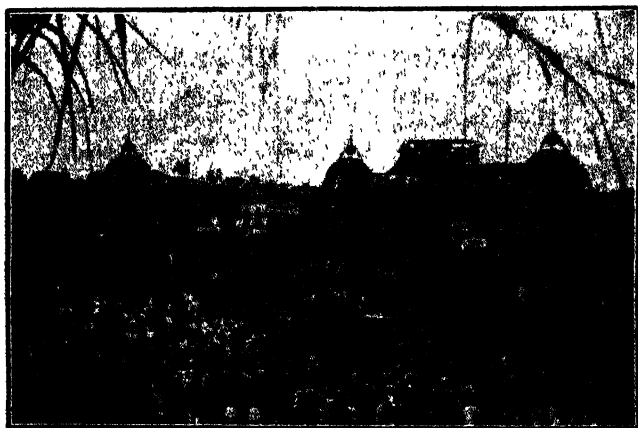
রথযাত্রা - পুরী

জগন্নাথদেবের রথ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতার রথ—কখনও মন্থরগতি, আবার কখনও বা দ্রুতগতি!

দেবতার রথযাত্রা আরম্ভ হইয়াছে—স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আনন্দে উদ্বেল।

ভিখারী ছোক্‌রা প্রায় কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না,—এমনই ভীড়! সে সবলে জনতা ভেদ করিয়া রথের নিকটে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সহসা জনতার একটা

প্রচণ্ড স্রোত সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত তাহার উপর আসিয়া পড়িল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পড়িয়া গেল।

নিকটবর্ত্তী পাঁচ-সাত জনের শত সাবধানতায়ও কিছুই হইল না। হতভাগার দেহের উপর দিয়া জনতা চলিয়া গেল,—লক্ষাধিক লোকের পদতলে পড়িয়া হতভাগা নিষ্পেষিত হইয়া গেল।

আমারও বোধ হয় শ্বাস রুদ্ধ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে আমি একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম।

পাঁচ

সূর্য্যের আলো কখন আসিয়া পুরীর রাজপথে প্রথম উঁকি দিয়া গিয়াছে তাহা আমি জানিতেই পারি নাই। জ্ঞান যখন হইল, তখন দেখিলাম রাস্তার এখানে সেখানে, আশে পাশে, চতুর্দ্দিকে—কেবল আলোর ছড়াছড়ি, রথের উৎসবে রাশি রাশি সূর্য্যের আলো আসিয়া লুটোপুটি খাইতেছে।

কিসের আনন্দ! হিন্দুর উৎসব রথ, আনন্দের উৎসব বটে। কিন্তু সেই উৎসবের মাঝেও যে কত বড় একটা নিরানন্দ—একটা অব্যক্ত বেদনা মিশ্রিত ছিল, আমি যে তাহার প্রধান সাক্ষী। হতভাগা ভিখারী ছোক্‌রা যখন মত্ত

জনতার পদতলে পড়িয়া ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিতেছিল, আমি যে তখন তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছি। স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহার জীবন বাঁচাইবার অন্তিম চেষ্টা,—নিজের বুকে অনুভব করিয়াছি তাহার বুকের শেষ নিঃশ্বাস !—

তবে ?—যে উৎসবের দেহে এত বড় একটা ক্ষত, যাহাতে এমন একটা করুণ বেদনা মিশ্রিত, যাহাতে একটি লোক পিষিয়া মরিল, সেই উৎসবের জন্য আবার এত আনন্দ কেন ?—

একটু ভাবিতেই বুঝিলাম, জাতির বৈশিষ্ট্য বোধ হয় এইখানেই। দুই-একটি লোকের ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্টে একটা বিরাট জাতির কিছুমাত্র অনুভূতি হয় না। একটা ভিখারী ছেলের দুঃখ-কষ্টকে জাতি যদি তাহার নিজস্ব বলিয়া মনে করিতে পারিত, তবে জাতির ইতিহাসে তাহা একটা 'সোনার যুগ' বলিয়া কীর্ত্তিত হইত।

ভিখারী ছোক্‌রার আশ্রয় হইতে আমি যে কখন কি ভাবে পড়িয়া গিয়াছিলাম, তাহা জানি না। সম্ভবতঃ হতভাগার মৃত্যুর পরে তাহার লাশ সরাইবার সময় আমি কোন প্রকারে তাহার কাপড় হইতে খুলিয়া পড়িয়াছিলাম। সুতরাং তাহার পরে সেই হতভাগার যে কি ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা জানিতে পারি নাই।

জানিতে না পারিলেও অনুমান করা অসাধ্য নহে। একে ভিখারী, দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি; তাহাতে আবার মৃত।—এমন লোকের কি আর একটা গৌরবজনক ব্যবস্থা হইবে ?—যাহোক

মাটিতে শুইয়া এমন কত কথাই না মনে হইতেছিল! আমার আশে পাশে অগণিত লোকজন তখন চলাফেরা করিতেছিল, পথঘাট ক্রমশঃই জনবহুল হইয়া উঠিতেছিল।—কেহ কেহ ঠিক আমার বুকের উপর দিয়াই চলিয়া গেল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কেহই আমাকে লক্ষ্য করিল না।

দাঁড়াইয়া স্তব পাঠ করিতেছে

হঠাৎ শুনিলাম, কয়েকজন লোক চীৎকার করিতেছে,—"স'রে যাও, স'রে যাও।"—দেখিলাম, একটি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সূর্য্য নমস্কার করিতে করিতে আসিতেছে, তাহারই লোকজন ঐ চীৎকার করিয়া লোক সরাইয়া দিতেছে।

লোকটি পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া কি স্তব পাঠ করিতেছে, আর পরক্ষণেই মাটিতে উপুড় হইয়া শুইয়া সূর্য্য প্রণাম করিতেছে। এইরূপ ভাবে ক্রমাগত দাঁড়াইয়া—শুইয়া—নানাভাবে সূর্য্যের বন্দনা করিতে করিতে কোন জলাশয়ের দিকে সে অগ্রসর হইতেছিল। ঐরূপভাবে চলিতে

চলিতে সে ক্রমশঃ আমার নিকটবর্ত্তী হইল এবং ঠিক আমার বুকের উপরেই সে উপুড় হইয়া সূর্য্য প্রণাম করিল। তাহার অসাধারণ ভক্তিতে আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

ভক্তির আবেশে তাহার চক্ষু দুটির অর্দ্ধেক প্রায় বন্ধ হইয়াই ছিল। কিন্তু সে যখন মাটি হইতে উঠিবে তখন তাহার সেই আধখানা চক্ষুতেও সে আমাকে দেখিয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ তাহার দুইটি চক্ষুই বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ভক্ত ব্রাহ্মণ আমাকে দেখিয়াই একটি পয়সা বলিয়া চিনিয়া লইল এবং

উপুড় হইয়া সূর্য্য প্রণাম করিল

অন্যের অলক্ষিতে আমাকে কুড়াইয়া তাড়াতাড়ি ট্যাঁকে গুজিয়া ফেলিল। সূর্য্য-ভক্তের ভক্তি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম!

সারাদিন ভক্তের কসরতের সঙ্গে সঙ্গে আমারও নানা রকম কসরৎ অভ্যাস হইল। অবশেষে দীর্ঘ সময় পরে তাহার গৃহে উপস্থিত হইলাম।

লোকটির আঙ্গিনায় প্রকাণ্ড একটি বাঁশ ঝুলানো ছিল। তাহাতে কাপড়-চোপড় শুকাইতে দেওয়া হয়। কিন্তু বাড়ী

আসিয়াই লোকটি দেখিল যে, প্রকাণ্ড একটি শকুনি বিশাল ডানা মেলিয়া প্রায় সমস্তটা বাঁশ দখল করিয়া বসিয়া আছে।

দেখিয়াই ঘৃণা ও বিরক্তিতে তাহার সমস্ত বুকটা ভরপূর হইয়া উঠিল। সে কয়েকবার হাততালি দিয়া তাহাকে তাড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু শকুনি তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। অথচ, না তাড়াইলেও নয়। সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"তাড়াও, তাড়াও,—সর্ব্বনাশ! ঘরের চালায় বসিলে নির্ব্বংশ হয়!—তাড়াও, শীগ্‌গির তাড়াও।"

লোকটি আর কি করে?—নিকটে কোন ইট-পাটকেল পাওয়া গেল না। অগত্যা ট্যাঁক্ হইতে আমাকে বাহির করিয়া শকুনির দিকে আমাকেই নিক্ষেপ করিল!

আমি বন্-বন্ করিয়া শকুনির দিকে ছুটিয়া চলিলাম। বাতাসের বেগে আমার দম্ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

শকুনি একটুও নড়িল না। আমি তাহার নিকটবর্ত্তী হইতেই তাহার বাঁকা ঠোঁটখানি খুলিয়া একটু হাঁ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কট্ করিয়া আমাকে ঠোঁটে ধরিয়াই—তাহার প্রকাণ্ড ডানা মেলিয়া আকাশে উড়িয়া পড়িল। আমি শকুনির ঠোঁটে আকাশে উড়িয়া চলিলাম।

আমি কতক্ষণ সেইভাবে ছিলাম তাহা বলিতে পারি না; কারণ, ভয়ে আমি তখন আধমরা, সময় নির্দ্ধারণ করিবার শক্তি আমার তখন একেবারেই ছিল না।

কিন্তু যতক্ষণই থাকি না কেন, সেই সময়ের মধ্যেই শকুনি

বোধ হয় তাহার ঠোঁটের সাহায্যেই আমার দেহের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিল। আমি একটা তামার পয়সা,—ইহা না বুঝিতে পারিলেও আমি যে তাহার কোন সুখাদ্য নহি, ইহা বুঝিতে বোধ হয় তাহার কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। সুতরাং সে আর দীর্ঘকাল আমাকে বহন করিতে স্বীকৃত হইল না,—ঝপ্ করিয়া আমাকে নীচে ফেলিয়া দিল।

আমি শূন্যে থাকিতেই কয়েকবার ঘুরপাক্ খাইয়া লইলাম, তারপর সোঁ-সোঁ শব্দে নীচে নামিতে লাগিলাম।

নামিতে নামিতে হঠাৎ ঠক্ করিয়া পড়িয়া গেলাম। যেখানে পড়িলাম সে একটা প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরের চূড়ায় ধাক্কা খাইয়া মন্দির ছাড়াইয়া প্রায় ত্রিশ হাত দূরে ছুটিয়া পড়িলাম।

কিন্তু এই দ্বিতীয়বার পতনে আমি বিশেষ কোন আঘাত পাইলাম না। কারণ, পড়িলাম কতকগুলি নরম মাটির উপরে। একটা প্রকাণ্ড ইঁদুর কিছু মাটি তুলিয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখিয়াছিল, আমি ঠিক্ সেই মাটির উপরে পড়িয়া রহিলাম।

হঠাৎ ঝপ্ করিয়া একরাশি মাটি গর্ত্তের মধ্যে ধ্বসিয়া পড়িল। আমি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। বুঝিতে পারিলাম, কোনরূপে এখান হইতে সরিতে না পারিলে আমাকেও হয়ত চিরকালের মত গর্ত্তের মধ্যে আশ্রয় লইতে হইবে।

ভয়ে ও উদ্বেগে আমি অর্দ্ধমৃত অবস্থায় সময় কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু তেমন অবস্থায়ও একটা কৌতূহল হইল। অমন সুন্দর মন্দির,—ইহাকে কোন্ মন্দির বলে ?

একটু পরে একদল যাত্রী আসিতেই বুঝিলাম সে-দেশের নাম কোনারক, মন্দিরটি 'কোনারকের মন্দির' বলিয়া খ্যাত। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার কারুশিল্প এখনও সকলের প্রাণে একটা বিস্ময় জাগাইয়া দেয়।

কোনারকের মন্দির

মন্দিরে সূর্য্যের পূজা হয়, সূর্য্যদেবতা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত। —আমি একমনে সূর্য্যের নিকট আমার আবেদন জানাইয়া কহিলাম,—"হে দেবতা! আমাকে চিরকাল অন্ধকারে আবদ্ধ ক'রো না প্রভো! আমায় রক্ষা কর।"

ছয়

দেবতার কাছে অনেকের প্রার্থনাই পৌঁছে না, —আমার প্রার্থনাও পৌঁছিল না। যাঁহাদের হাত আছে, পবিত্রভাবে যাঁহারা দেবতার পায়ে অঞ্জলি দিতে পারেন, যাঁহাদের মুখ আছে, পবিত্র-মনে বিশুদ্ধভাবে যাঁহারা দেবতার স্তবস্তুতি পাঠ করিতে পারেন,—তাঁহাদের প্রার্থনাও সকল সময় দেবতার কাছে পৌঁছে কি? তাঁহাদের প্রার্থনাই যদি না পৌঁছে, তবে আর আমার মত একটা ক্ষুদ্র অচল পয়সার প্রার্থনায় দেবতার আসন কতটুকু টলিবে?

আমি তখনও ইঁদুরের গর্ত্তের মুখে নরম মাটির উপর পড়িয়া ছিলাম। তখনও ঝুর্‌ঝুর্‌ করিয়া কিছু কিছু মাটি গর্ত্তের মধ্যে ধ্বসিয়া পড়িতেছিল। একরাশি মাটির সঙ্গে আমি যদি গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যাই!—সেই আতঙ্কে অস্থির হইয়া আমিও তখন একমনে দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতেছিলাম।—কিন্তু, বোধ হয় সকলই বৃথা হইল।

ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে আমার বুকের তলায় সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। কি একটা শক্তি যেন তীব্রবেগে পৃথিবীর ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইল,—তাহার প্রচণ্ড ধাক্কা সামাল্ করিতে না পারিয়া আমি একবার ঊর্দ্ধে ও পরক্ষণেই বহুদূরে কোথায় নিক্ষিপ্ত হইলাম। দেখিলাম, একটা বিশাল সাপ আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহারই প্রচণ্ড শক্তিতে আমি প্রায় তিন হাত দূরে যাইয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িলাম।

দূরে কতকগুলি ছোক্‌রা খেলা করিতেছিল। তাহারা দেখিল যে, একটা প্রকাণ্ড সাপ তাহাদেরই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহারা চীৎকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

মন্দিরের এক পাশে একটি বৃদ্ধ বসিয়া সম্ভবতঃ তাঁহার অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। তীব্রবেগে সাপটি বাহির হইবার সময় আমি যে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম এবং পরক্ষণেই একটু মৃদু ঠুং শব্দ করিয়া আমি যে একখণ্ড পাথরের উপর পড়িয়াছিলাম,—তাহা বৃদ্ধের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না।

• সাপটি চলিয়া গেলে বৃদ্ধের কৌতূহল হইল, আমি যে কি পদার্থ, তাহা তিনি একবার ভাল করিয়া দেখিলেন।

তিনি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উঠিয়া আসিলেন। তারপর নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে, একটি পয়সা পড়িয়া আছে।

বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সাপের মাথায় মণি থাকে, এই প্রবাদই তিনি এতদিন শুনিয়াছিলেন, কিন্তু আজ তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন যে, সাপের মাথায় পয়সাও থাকে।

আমি—পয়সাটি—অতি পুরাতন হইলেও, বৃদ্ধ আমাকে কোন ঐশ্বরিক দান মনে করিয়া কয়েকবার মাথায় ঠেকাইলেন, তারপর অতি সাবধানে তাঁহার কাপড়ের এক কোণায় বাঁধিয়া রাখিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের দুয়ার খোলা হইল। বৃদ্ধটি কোনারকের মন্দির জীবনে আর কখনও দেখেন নাই। তাই তিনি গভীর ভক্তির সহিত মন্দিরে অধিষ্ঠিত সূর্য্যদেবতার পূজা করিয়া অন্যান্য তীর্থ-দর্শনে বাহির হইলেন।

ভুবনেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধের আরও দশ-বারটি সঙ্গী জুটিয়া গেল।

কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ যাইবার রেলপথে ভুবনেশ্বর তীর্থ অবস্থিত।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ কাশীধামে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের বন্যা বহিয়া যাইতেছিল, তখন সাধারণ হিন্দুগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। উড়িষ্যায় তখন কেশরী-বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, জনসাধারণকে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিতে হইলে,—হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে,—কিছু জাঁকজমক ও বাহ্য আকর্ষণের পদার্থ আবশ্যক। সুতরাং তাঁহারা অগণিত দেবমন্দির প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহারই ফলে ভুবনেশ্বরে 'লিঙ্গরাজ'-মন্দির উদ্ভূত হইয়াছে।

ভুবনেশ্বর বা ত্রিভুবনেশ্বর এই লিঙ্গরাজ-মন্দিরে অধিষ্ঠিত। মন্দিরের উন্নত শীর্ষদেশ বহু মাইল দূর হইতে দর্শকদের দৃষ্টি-গোচর হইয়া তাহাদের প্রাণে একটা অপূর্ব্ব ভক্তি ও বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

লিঙ্গরাজ-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ছোট-বড় আরও অনেক

মন্দির আছে ; তাহাদের সংখ্যা পঁয়ষট্টি হইবে। কেবল লিঙ্গরাজ-মন্দির ব্যতীত অন্যান্য মন্দিরে অহিন্দুগণও প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু লিঙ্গরাজ-মন্দিরে অহিন্দুগণ আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না।

মন্দিরের কারুকার্য্যে মুগ্ধ হইয়া লর্ড কার্জ্জন একবার তাহা দেখিতে গিয়াছিলেন ; তাঁহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। বাহিরে উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি সেই মঞ্চে দাঁড়াইয়া মন্দিরের অভ্যন্তর দর্শন করেন।

সৌভাগ্যক্রমে ঐ বৃদ্ধ লোকটি ছিলেন হিন্দু—ব্রাহ্মণ। সুতরাং মন্দিরে প্রবেশ করিতে বা দেববিগ্রহ দর্শন করিতে আমাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। আমি তাঁহার কাপড়ের খুঁটে বাঁধা থাকিয়া ভুবনেশ্বরের বহু মন্দিরই দর্শন করিলাম।

দেখিলাম, সুবিস্তৃত সবুজ মাঠের উপর 'রাজরাণী'-মন্দির একটা দর্শনযোগ্য জিনিস বটে। দেখিয়া মনে হয় উহা সম্ভবতঃ কোন আরামদায়ক বিলাস-ভবনের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল —নির্জ্জন আরাধনার জন্য নির্ম্মিত হয় নাই ; কিন্তু দ্বারদেশে নবগ্রহের কারুশিল্প দেখিবার পর সকলেরই সেই ধারণা ঘুচিয়া যায়।

বৃদ্ধ এক পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মশাই, এই মন্দিরের নাম 'রাজরাণী'-মন্দির হ'ল কেন ?"

পাণ্ডা কহিলেন,—"যে পাথর দিয়ে এই মন্দিরটি তৈরী
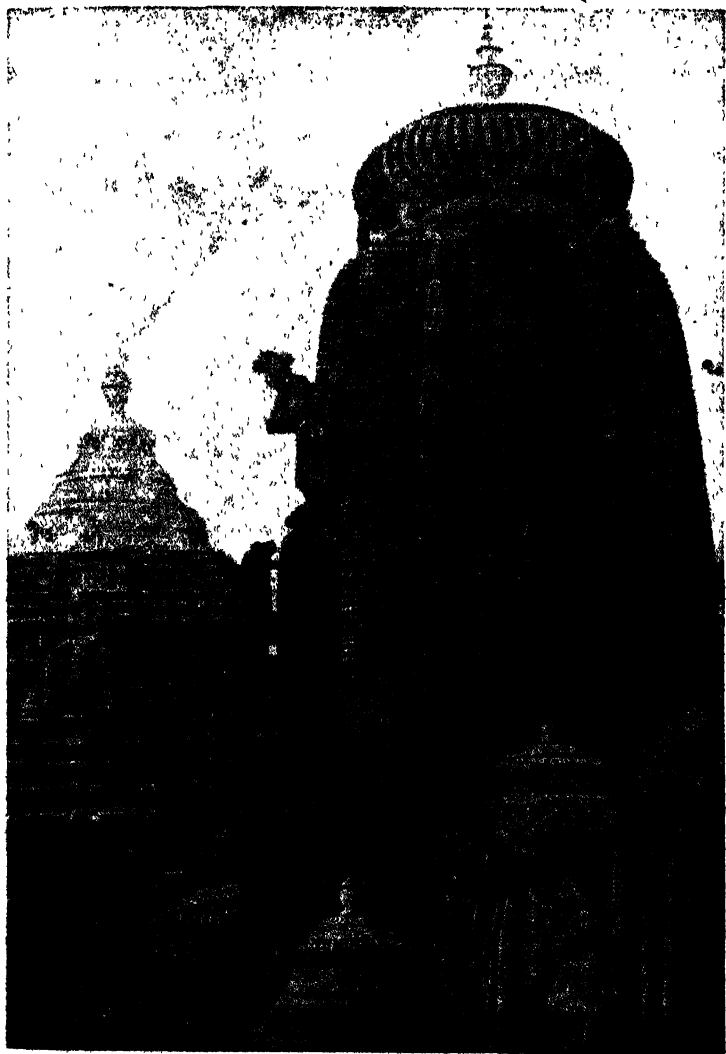
ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ-মন্দির ও তাহার পার্শ্ববর্তী মন্দিরসমূহ

হয়েছে, সেই পাথরের নাম 'রাজরাণী' পাথর কাজেই মন্দিরের নামও হয়েছে 'রাজরাণী'-মন্দির।"
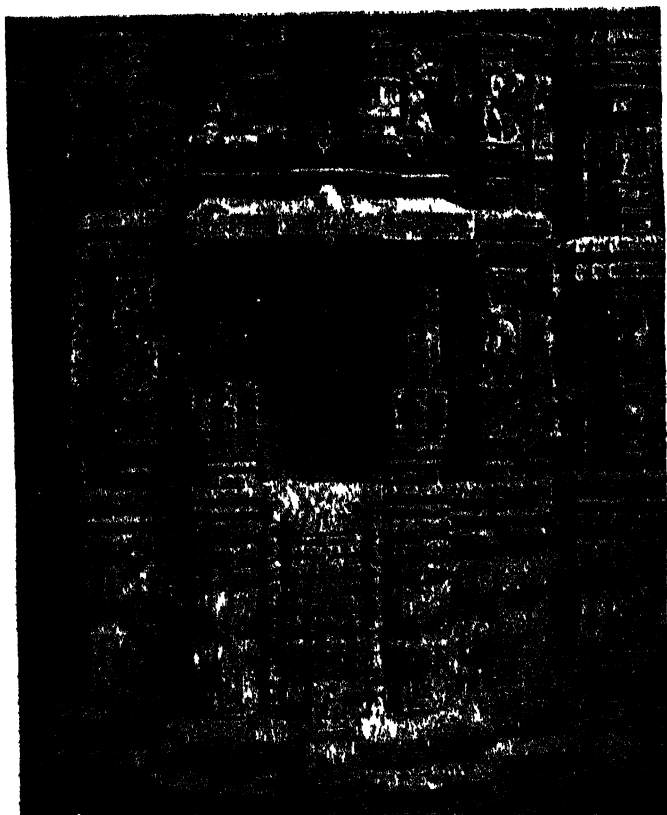
'রাজরাণী'-মন্দিরের কারুশিল্প

'রাজরাণী'-মন্দিরের সৌন্দর্য্য কেবল এক মুহূর্ত্তে উপলব্ধি

করা যায় না। তাহার কারুশিল্প প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের গৌরব বিশেষ।

'রাজরাণী'-মন্দিরের পরে আমরা ব্রহ্মেশ্বর-মন্দির দর্শন করিলাম। শুনা যায়, স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা—যিনি দেবতাদের শিল্পী, তিনি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কেশরী-বংশীয় রাজাদের রাজচিহ্ন—সিংহ মূর্ত্তি (বা 'শার্দ্দূল') ভুবনেশ্বরের প্রায় প্রত্যেক মন্দিরেই দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মেশ্বর-

বিন্দু-সরোবর

মন্দিরে নানা প্রকার দেবদেবী ও মনুষ্যমূর্ত্তি এবং নানা জীব-জন্তুর মূর্ত্তি সংশ্লিষ্ট আছে। কিন্তু মেঘেশ্বর-মন্দিরে হরিণ, বানর প্রভৃতি নানা ইতর-জন্তুর মূর্ত্তিই বেশী দেখা যায়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি পাণ্ডার সঙ্গে বিভিন্ন মন্দিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

পাণ্ডা কহিলেন,—"বাবু! এখন বিন্দু-সরোবরে স্নান সেরে নিন। পৃথিবীর সমস্ত তীর্থের পবিত্র জল এই বিন্দু-

সরোবরে মিশানো আছে। কাজেই বিন্দু-সরোবরে স্নান কর্‌লে আর অন্য তীর্থে যাবার দরকার হয় না। পরকালে যে অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে তাতে সন্দেহ নেই।”

বৃদ্ধ লোকটি অক্ষয় স্বর্গের মহালাভ এড়াইতে পারিলেন না। তিনি বিন্দু-সরোবরে অবগাহন করিতে করিতে বলিলেন,—“আচ্ছা এ তো দেখ্‌ছি প্রকাণ্ড দীঘি; তবে এর নাম বিন্দু-সরোবর হ'ল কেন?”

পাণ্ডা কহিলেন,—“সে একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস। আচ্ছা, তা' বল্‌ছি।—অতি প্রাচীন কালে এখানে ভ্রমিল নামে এক রাজা ছিলেন। রাজা ভ্রমিলের দুটি ছেলে ছিল। ভ্রমিল একবার তপস্যা ক'রে, দেবতার কাছ থেকে বর আদায় ক'রে নিলেন যে,—দেব—যক্ষ—রক্ষঃ—পুরুষ কেউ কোন অস্ত্রেই তাঁর পুত্রদের ধ্বংস করতে পার্‌বে না। তারপর ভ্রমিল তো স্বর্গে চ'লে গেলেন। পিতার মৃত্যুর পর রাজকুমার দু'জন অতি দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠ্‌ল। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে কেউ তাদের মার্‌তে পার্‌বে না—এই আনন্দে দু'জনে দুটি দানব হয়ে দাঁড়াল, আর যেখানে সেখানে যা-তা ক'রে বেড়াতে লাগ্‌ল।

“এই ভুবনেশ্বরে এক সময়ে একটিমাত্র আমগাছ ছিল এবং এ জায়গা ছিল গভীর বন। মহাদেব এর নাম রেখেছিলেন, ‘একাম্র-কানন’। একদিন পার্ব্বতী দেবী মহাদেবের জন্য ফুল-বেলপাতা সংগ্রহ করতে এখানে আসেন; ভ্রমিলের ছেলে দুটি দেবীকে দেখ্‌তে পেয়ে একটু অপমান করে।

"পার্ব্বতী সে কথা মহাদেবকে জানালে তিনি বলেন, 'তুমি এদের বিনা অস্ত্রে কেবল পায়ে দ'লে—পিষে মেরে ফেল।' পার্ব্বতী দেবী তাই কর্‌লেন। তিনি রণচণ্ডিকা মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ঐ অজেয় দানব দুটিকে পদদলিত ক'রে মেরে ফেল্‌লেন।

"দেবীর পদভরে একাম্র-কাননের এই অংশ হ্রদে পরিণত হয়ে গেল। পার্ব্বতী দেবীর অপর নাম বিন্দুবাসিনী তা' আপনি নিশ্চয়ই জানেন। বিন্দুবাসিনীর নাম চিরস্মরণীয় কর্‌বার জন্য মহাদেব এই হ্রদের নাম রাখ্‌লেন—'বিন্দু-সরোবর'।"

পাণ্ডার এই বর্ণনা শুনিতে—বৃদ্ধ ও পাণ্ডার চতুর্দ্দিকে অনেক লোক জড় হইয়া গিয়াছিল। এখন পাণ্ডার বর্ণনা শেষ হইলে সকলেই ভীড় ভাঙ্গিতে সচেষ্ট হইল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিও পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া, চক্ষু বন্ধ করিয়া তখন স্তব পাঠ করিতেছিলেন,—"ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং—"

হঠাৎ একটা ছেলে পা পিছলাইয়া জলে পড়িয়া গেল। ছেলেটা পড়্‌বি তো পড়্‌—একেবারে সেই বৃদ্ধেরই ঘাড়ে!

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধটি মুহূর্ত্তের মধ্যে 'অথই' জলে তলাইয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিল।

বৃদ্ধের সহিত জলমগ্ন হইবার পূর্ব্বক্ষণেই আমার অমন শান্ত বুকটাও একবার ধড়াস্ করিয়া উঠিল। তারপর যে কি হইয়াছিল, বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও তাহা বলিতে পারি না।

সাত

আমার প্রথম জ্ঞান হইল কি-একটা ধোঁয়ার উৎকট গন্ধে! একটা তীব্র ধোঁয়ায় আমার প্রায় দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল—গভীর চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সামান্য পয়সার চীৎকার বিশাল জগতের একটা প্রাণীর কাছেও পৌঁছে না,—পয়সা উঠিয়া বসিতেও অক্ষম। সুতরাং আমার সকল চেষ্টাই বিফল হইল।

প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, আমি কোথায় আছি। ধীরে ধীরে চারিপাশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, প্রকাণ্ড এক গাছের নীচে এক রুক্ষকেশ সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার নিকটেই গাছের একটা শিকড়ের কাছে পড়িয়া রহিয়াছি। অদূরে একটা ধুনী জ্বলিতেছে।

আমি যে কেমন করিয়া সেখানে আসিয়াছিলাম তাহার ধারণা করিতে পারিলাম না। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কি হইল? কেহ কি তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই?—আমিই বা তাঁহার কাপড়ের খুঁট হইতে কেমন করিয়া এখানে আসিলাম?—এসব প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিলাম না।

বৃদ্ধ মারা গিয়াছেন, এ ধারণা করা বড়ই কষ্টকর বোধ হইল। একটা কল্পনা করিয়া মনকে আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিলাম। স্থির করিলাম, বৃদ্ধ রক্ষা পাইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছেঁড়া ময়লা কাপড়খানি হয়ত কোথায়ও

ফেলিয়া গিয়াছেন, আর আমাকে আঁচলে বাঁধিয়া রাখায় তাঁহার এত বড় একটা বিপদ্ হইয়াছিল, সুতরাং আমাকে একটা 'অশুভ পদার্থ' মনে করিয়া সম্ভবতঃ তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

নিজের উপর ধিক্কার হইল। বাস্তবিকই আমি একটা অকল্যাণকর পদার্থ! সুতরাং বৃদ্ধ যদি আমাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়া থাকেন, তবে ভালই করিয়াছেন।

বৃদ্ধের প্রতি আমার কিছুমাত্র বিরক্তি বা অসন্তোষের উদ্রেক হইল না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার একটা প্রশ্ন উদয় হইল,—'আচ্ছা, বৃদ্ধ ভদ্রলোক যদি আমাকে ত্যাগ করিয়াই গিয়া থাকেন, তাহাতেই বা কি হইল? আমি এই সন্ন্যাসীর পাল্লায় আসিলাম কিরূপে?'

একটু ভাবিতেই ইহার একটা জবাব পাইলাম, কে যেন বলিয়া দিল, 'সন্ন্যাসী সেই ছেঁড়া কাপড় দেখিতে পাইয়া তাহা হইতে তোমায় খুলিয়া লইয়া আসিয়াছে।'

এই কাল্পনিক উত্তরে প্রাণে একটা অশান্তি বোধ করিলাম। সন্ন্যাসী,—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—তাহার আবার অর্থলোভ কেন?

—যাহোক্, সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে সেই ভাবেই পড়িয়া রহিলাম প্রায় তিন দিন। অবশেষে একদিন সন্ন্যাসা তাঁহার সেই গাছের নীচের আশ্রম ছাড়িয়া বাহির হইলেন।

তাঁহার উলঙ্গপ্রায় মূর্ত্তিখানি তিনি একটি গেরুয়া কাপড়ে ঢাকিয়া অনেকটা মার্জ্জিত করিয়া লইলেন। তারপর আরও

কয়েকটি টাকা-পয়সার সহিত তিনি আমাকেও তাঁহার ট্যাঁকে গুঁজিয়া লইতে ভুলিলেন না।

বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া অনেকক্ষণ চলিয়া তিনি আবার সেই
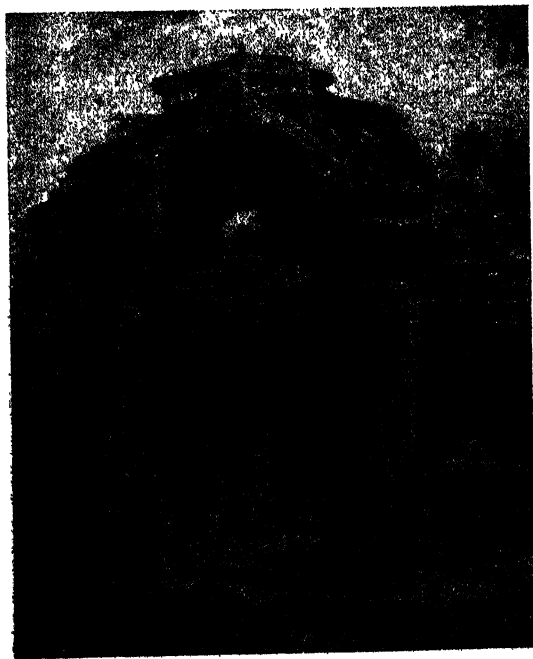
মুক্তেশ্বর-মন্দির

ভুবনেশ্বরেই আসিলেন। ইতস্ততঃ কিছুক্ষণ ঘুরিয়া তিনি অবশেষে মুক্তেশ্বর-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

মন্দিরের প্রকাণ্ড তোরণ। সন্ন্যাসী সেই তোরণের আশে

পাশে কাহাকে যেন অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করিয়াও তাহার দেখা মিলিল না।

তারপর অপরাহ্ণে তিনি আবার কোথায় যাত্রা করিলেন।

কিছুক্ষণ চলিয়া তিনি যেখানে উপস্থিত হইলেন, সেই

খণ্ডগিরি

স্থানের নাম উদয়গিরি। উদয়গিরির নিকটেই খণ্ডগিরি। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি নামক পাহাড় দুইটিতে প্রচুর দর্শনীয় জিনিস আছে।

প্রবাদ আছে, এক সময়ে ইহারা নাকি হিমালয়েরই অংশ ছিল। কিন্তু ত্রেতাযুগে সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কায় যাইবার

উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্র যখন সমুদ্রের উপর সেতু প্রস্তুত করাইতেছিলেন, তখন বীর হনুমান সমুদ্র বাঁধাই করিবার জন্য হিমালয় হইতে ইহাদিগকে ভাঙ্গিয়া আনিয়াছিলেন।

ইহাদের অন্তর্গত অনেকগুলি গুম্ফ বা গুহা আছে। তন্মধ্যে হস্তীগুম্ফ, রাণীগুম্ফ, গণেশগুম্ফ, জয়া-বিজয়াগুম্ফ, সর্পগুম্ফ, অনন্তগুম্ফ প্রভৃতি প্রধান।

এই সকল পার্ব্বত্য গুহাগুলির প্রায় সর্ব্বত্রই বৌদ্ধযুগের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, খৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিবারও প্রায় দুই-এক শত বৎসর পূর্ব্বে এইগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এখনও ইহাতে যে সকল কারুকার্য্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে দর্শকমাত্রই বিস্মিত হন।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের আধিপত্যকালে, বৌদ্ধ নৃপতিগণ যে কত অর্থব্যয়ে সাধারণ পাহাড় কাটাইয়া তাহা হইতে বাসযোগ্য এমন সুন্দর ও সুরম্য গুহাসমূহ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে আত্মহারা হইতে হয়।

কক্ষের পর কক্ষ ও সুদৃশ্য সোপান-শ্রেণীতে একতল, দ্বিতল ও ত্রিতল অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসী কাহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বত্রই নিরাশ হইয়া ফিরিলেন।

সন্ন্যাসী নিতান্ত উত্তপ্তভাবে চীৎকার করিয়া হাঁকিলেন,—"মাধো রাও!"—

কোন উত্তর পাওয়া গেল না—কেবল একটা উচ্চ প্রতিধ্বনি পাহাড়ে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

উদয়গিরির রাণীগুম্ফা
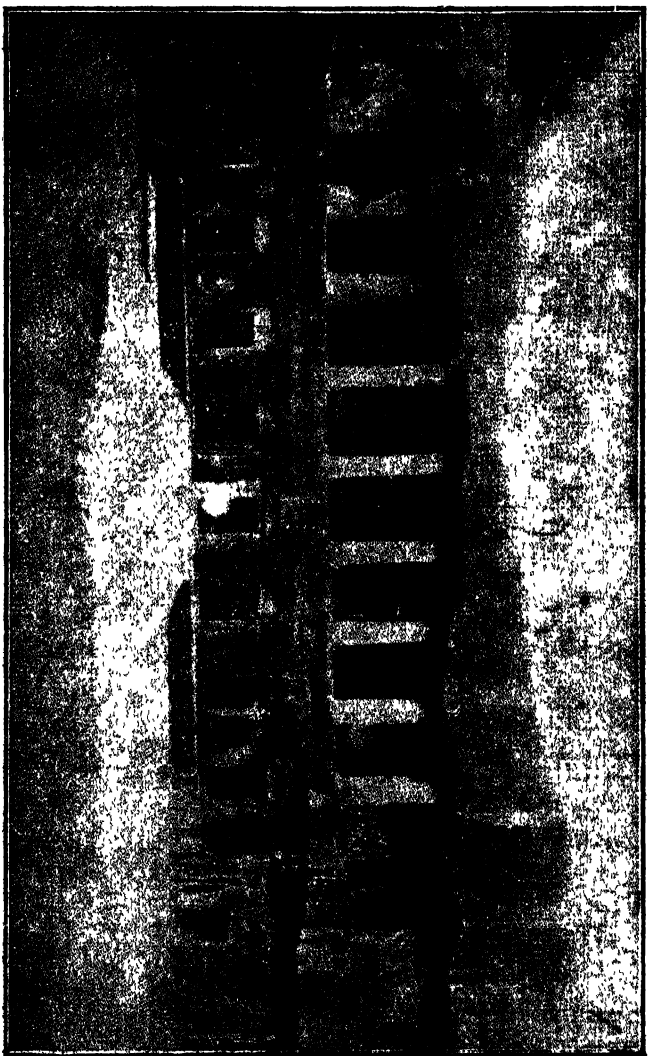
আমি ভাবিলাম, এ আবার কোন্ রহস্য? সেই বহুবর্ষ পূর্ব্বে মারাঠা দস্যুদিগের প্রাদুর্ভাবকালে এ সকল গুহা ডাকাতের আশ্রয়স্থান ছিল শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এখন কি তাহা সম্ভব? এখনও কি দুই-একজন ডাকাতের সর্দ্দার সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে এখানে আত্মগোপন করিয়া থাকে?—অসম্ভব নহে।

সন্ন্যাসী আবার হাঁকিলেন,—"মাধো রাও!—"

আবার একটা প্রতিধ্বনি হইল। কিন্তু এবার সঙ্গে সঙ্গে কে একজন গুরুগম্ভীর স্বরে তাহার প্রত্যুত্তর করিয়া উঠিল।

"কোন্ হ্যায়?" সন্ন্যাসী চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রত্যুত্তরে একটা বিশাল প্রাণী শূন্যে লাফাইয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর দেহ কাহার প্রবল আক্রমণে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।-পতনমাত্র সন্ন্যাসীর তপ্তরক্তে কক্ষতল রঞ্জিত হইয়া গেল!

আট

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির নির্জ্জন গুহায় ও তাহাদের আশেপাশে মাঝে মাঝে দুই-একবার ছোটখাট ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, ইহা কেহ কেহ শুনিয়াছিল; সেইজন্য যাত্রীরা সাধারণতঃ সেই সকল স্থানে দল বাঁধিয়া যাতায়াত করিত।

কিন্তু এসব ডাকাতির কথা জানা থাকিলেও, কেহ বোধ হয় একবার কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, চোর-ডাকাতের কর্ত্তারা অনেক সময় সন্ন্যাসীর বেশে সেই গহ্বর-মধ্যেই নিশ্চিন্তে লুকাইয়া থাকিত, এবং সুযোগ পাইলেই নিরীহ যাত্রীদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত।

কে ভাবিয়াছিল যে, আমিও তেমনই একজন ডাকাত-সর্দ্দারের হাতে পড়িয়াছি। নিজের অবস্থা যখন আমি বুঝিতে পারিলাম, তখন ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। কিন্তু আমার মানসিক এই ভীষণ অবস্থার মধ্যেও আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি নাই। ভাবিলাম, ঈশ্বরের কি অদ্ভুত সূক্ষ্ম বিচার! ছদ্মবেশী ডাকাতকে শাস্তি দিবার জন্য তিনি যে বাঘের আকারে কাহাকে সেই পর্ব্বতগুহায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহা কে জানে?

—একে একে সমস্ত কথা আমার মনে হইতে লাগিল। সুদূর আসামের জঙ্গল হইতে আমি কেমন করিয়া বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলাম, কেমন করিয়া সেখান হইতে ধীরে ধীরে এক সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে আসিয়াছিলাম, তারপর কেমন করিয়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে ইতস্ততঃ নানা স্থান ঘুরিয়া অবশেষে এই গুহামধ্যে আসিয়াছিলাম, তাহার সমস্তই মনে হইতে লাগিল।

কিন্তু একটা কথা তখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝি নাই।—'মাধো রাও' লোকটি কে? সন্ন্যাসী গুহামধ্যে চীৎকার করিয়া ডাকিয়াছিল,—"মাধো রাও!" বোধ হয় সেই চীৎকারে

বিরক্ত হইয়া কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়াছিল

আমার বিশ্বাস—দৃঢ় বিশ্বাস,—মাধো রাও লোকটি নিশ্চয়ই সেই ডাকাত-সন্ন্যাসীর কোন সহচর হইবে। দুইজনে মিলিত হইয়া কাহারও সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু ভগবানের বিচারে তাহা চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গেল।

মৃতের সঙ্গে বাস করিতে কেহই চাহে না। কারণ, তাহার নিস্পন্দ তুষার-শীতল স্পর্শে সকলেরই প্রাণ কাঁপিয়া উঠে,—কি-একটা বিভীষিকায় বুকটা আড়ষ্ট হইয়া যায়! কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, ঘটনাচক্রে আমি মৃতের সঙ্গে বাস করিতেও বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাও কেবল একদিন দুইদিন নহে, সুদীর্ঘ চারি-পাঁচদিন আমি মৃত সন্ন্যাসীর দেহেই বাস করিয়াছিলাম।

বাঘের হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই আমার চৈতন্য লুপ্ত হইয়াছিল। জ্ঞান যখন হইল, তখন দেখিলাম, সন্ন্যাসী রক্তাক্তদেহে পড়িয়া আছে, বাঘ তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া চলিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসীর রক্ত প্রথমে গাঢ় লাল রক্তের চাপে পরিণত হইল, তারপর ক্রমশঃ তাহা কালো রক্তের চাপে জমাট্ বাঁধিল। সন্ন্যাসীর রক্তে স্নান করিয়া আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম।

চারি-পাঁচ দিন পরে হঠাৎ একদিন সেই নির্জ্জন বন-জঙ্গল কুকুরের চীৎকারে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। একদল সাহেব গুটিকয়েক শিকারী কুকুর লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া, ডাকাত-সন্ন্যাসীর মৃতদেহের সঙ্গে

আমি যে কক্ষে পড়িয়াছিলাম তাহাতে প্রবেশ করিতেই কুকুরগুলি দ্বিগুণ চীৎকার করিতে লাগিল—সাহেবের চোখেমুখে ভয় ও বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

যাহোক্ দুইজন সাহেব নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে কয়েকটি লোক লইয়া আসিলেন এবং তাহাদের সাহায্যে বনের মধ্যে একটি কবর খুঁড়িয়া সন্ন্যাসীকে সেইখানে পুঁতিয়া ফেলিলেন।

পুঁতিবার জন্য সন্ন্যাসীকে যখন লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে অন্যান্য টাকা-পয়সার সহিত আমিও মাটিতে গড়াইয়া পড়িলাম। একটি সাহেব আমাদিগকে কুড়াইয়া লইলেন এবং কিছুক্ষণ বেশ মনোযোগের সঙ্গে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অবশেষে তাঁহার পকেটে পুরিলেন,—আমার আবার এক নূতন আশ্রয় জুটিল।

সাহেবের দল তখন ছুটিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। আমি ভাবিলাম, ইহা আমার পক্ষে একটা কম সৌভাগ্যের কথা নহে, সৎসঙ্গে থাকিয়া নানা দেশ দেখিবার সুযোগ পাইব।

বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূলে মাদ্রাজ সহর। সাহেবের দল একদিন সেই মাদ্রাজে আড্ডা জমাইলেন।

মাদ্রাজে অধিকাংশই হিন্দু, কিছু খৃষ্টান এবং মুসলমানও আছে। মাদ্রাজের জন্মকথা বলিতে গেলে অনেক দিনের পুরাতন কথা তুলিতে হয়। তখন চন্দ্রগিরির রাজা রঙ্গরায় দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরের রাজার প্রতিনিধি ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফ্রান্সিস্ ডে নামক এক সাহেব ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে

তাঁহার নিকটে কিছু ভূমি প্রার্থনা করেন। রাজা রঙ্গরায় তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেই স্থানে এক দুর্গ প্রস্তুত করিলেন এবং তাহার নাম হইল ফোর্ট সেণ্ট্ জর্জ্জ।

ফোর্ট সেণ্ট্ জর্জ্জ নির্ম্মাণ
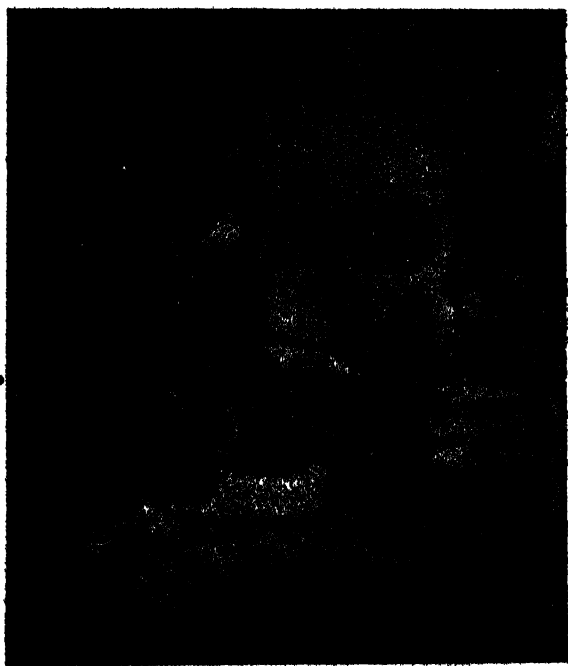
ফোর্ট সেণ্ট্ জর্জ্জ যেস্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখন তাহার নাম ছিল মসলিপত্তন। এই মসলিপত্তনই কালক্রমে মাদ্রাজে পরিণত হইয়াছে।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কাউণ্ট লালী ফরাসীদিগের গবর্ণর হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া ইংরেজদিগের আধিপত্য কমাইতে সঙ্কল্প করিলেন। লালী ভারতবর্ষে আসিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই মসলিপত্তন আক্রমণ করিলেন। সেণ্ট্ জর্জ্জ তাহাতে বিশেষ-ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িল। ক্লাইব তখন ইংরেজদিগের উদীয়মান নেতা। তিনি বাঙ্গালাদেশ হইতে একদল সৈন্য

মান্দ্রাজে 'বীচ্ রোড্'

পাঠাইয়া সেণ্ট্ জর্জ্জ দুর্গ রক্ষা করিলেন। ফরাসীদিগের সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল।

ক্লাইব সর্ব্বপ্রথম এই মসলিপত্তনের কুঠীতেই কেরাণীগিরি করিয়াছিলেন। শুনা যায়, সেই সময় তিনি নাকি নিজের

জীবনে হতাশ হইয়া কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে সেই ক্লাইবই ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

মসলিপত্তনের সেই পুরাতন দুর্গে এখন সরকারী আফিস-গুলির অধিকাংশ অবস্থিত। দুর্গের ভিতর দেখিবার মত অনেক জিনিস আছে। সেণ্ট্ মেরীজ্ চার্চ্চ (St. Mary's

মান্দ্রাজের একটি রাজপথ

Church) নামে সেখানে একটি গির্জ্জা আছে। ভারতবর্ষে উহাই ইংরেজদিগের সর্ব্বপ্রথম গির্জ্জা।

মান্দ্রাজে সমুদ্রের ধার দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, তাহা বেড়াইবার উৎকৃষ্ট স্থান। তথায় হাইকোর্ট, ল' কলেজ প্রভৃতি অনেক বড় বড় সুদৃশ্য অট্টালিকা আছে।

সাহেবদিগের একদিন সখ হইল, তাঁহারা সমুদ্রে সাঁতার কাটিবেন। স্থানীয় কয়েকজন লোকের সহিত সেই বিষয়ে তাঁহাদের আলাপ হইতেছিল। লোকগুলি জিজ্ঞাসা করিল, —"সাহেব, তোমরা সাঁতার কাট্‌তে জান?"

তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহাদের কেহই সাঁতার কাটিতে পারেন না। তাহাতে স্থানীয় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল,— "তবে তোমরা সাঁতার কাট্‌বে কি ক'রে?"

একজন সাহেব বলিলেন,—"সে তোমরা দেখে নিও। আমাদের কাছে এমন পোষাক আছে, যা গায়ে দিয়ে কেউ জলে নাম্‌লে সে কখনও ডুব্‌তে পারে না। পৃথিবীর কোন কোন বন্দরে দমকল বিভাগের কর্ম্মচারীরা এখন এই পোষাক ব্যবহার কর্‌ছে। তার উদ্দেশ্য এই যে, কর্ম্মচারীরা যদি দৈবাৎ জলে প'ড়ে যায়, তা' হলেও কোন বিপদ্ হবার সম্ভাবনা থাকে না।"

সাহেবের বক্তৃতা শুনিয়া আমার বড়ই আমোদ হইল। কিন্তু সবচেয়ে আমোদ হইল তাঁহাদের সাঁতার দেখিয়া। তাঁহারা কেহই সাঁতার কাটিতে জানেন না, অথচ কেমন আনন্দের সহিত তাঁহারা সাঁতার কাটিতেছিলেন। জলে ডুবিবার কিছুমাত্র আশঙ্কা ছিল না।

সাহেবদিগকে তেমনভাবে সাঁতার কাটিতে দেখিয়া স্থানীয় লোকেরা মনে করিল, সাহেবেরা বুঝি দেবতা!

তাহাদের একজন কহিল,—"সাহেব! সমুদ্রের জল এখন

শান্ত, কাজেই সাঁতার কাট্‌তে পেরেছ। কিন্তু যেখানে জলের বেগ খুব তীব্র, সেখানে সাঁতার কাট্‌তে সাহস পাও ?”

আমি যাঁহার পকেটে ছিলাম, সেই সাহেব ছিলেন প্রকাণ্ড

অভিনব পোষাক পরিয়া সাহেবেরা সাঁতার কাটিতেছেন

জোয়ান। তিনি বলিলেন,—“আমি সব জায়গায়ই সাঁতার কাট্‌তে রাজী আছি, কিন্তু এই জামা গায়ে দিয়ে।”

লোকটি বলিল,—“হাঁ, তা' নিশ্চয়ই।—বেশ তা' হলে একদিন তোমায় কাবেরী ফল্‌স্‌-এ নিয়ে যাব।”

ইহার পরে এক নির্দ্দিষ্ট তারিখে সাহেবেরা সেই লোকটির সঙ্গে কাবেরী জলপ্রপাতের নিকট উপস্থিত হইলেন।

কাবেরী জলপ্রপাত তখন তীব্রবেগে ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। দূর হইতে তাহার গুরুগম্ভীর শব্দে আমার বুকে যেন কেমন একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। সাহেব যখন তাঁহার কোমর-বন্ধনীর মানিব্যাগে বেশ করিয়া আমাদিগকে আঁটিয়া লইলেন, তখন মুহূর্ত্তের জন্য একবার জলপ্রপাতের স্বরূপ দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

সাহেব তাঁহার জলে ভাসিবার পোষাকটি বেশ করিয়া গায়ে জড়াইলেন, তারপর একটা অট্টহাস্যে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া অপরূপ ভঙ্গীতে তীরের মত সোজা হইয়া সেই জলপ্রপাতের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন।

—কিছুই অনুভব করিতে পারি নাই। কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, সাহেবের দুঃসাহস দেখিয়া কাবেরী জলপ্রপাতের তীব্রগতি বিন্দুমাত্র মন্দীভূত হয় নাই,—তাহার গতি তেমনই ছিল—উদ্দাম, উত্তাল।

নয়

দুঃসাহসের পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইল। অনেক দূরে সাহেবের দেহ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তিনি তখন মৃত,

তাঁহার সমস্ত শরীর পাহাড়ের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বড় গর্ব্ব—বড় অহঙ্কারের জিনিস—সেই জলে ভাসিবার পোষাকটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও শতচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

এমনভাবে একটি সাহেবের মৃতদেহ পাইয়া সকলেই ভাবিল, ইহাকে লইয়া এখন কি করা যাইবে? এক ব্যক্তি পরামর্শ দিল—"একে নিয়ে রাজবাড়ীতে চ'লে যাও। যা' কিছু কর্‌বার মহারাজ, কি মন্ত্রী—ওঁরাই কর্‌বেন।"

কথাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হইল। সকলেই মৃতদেহটিকে রাজবাড়ীতে লইয়া গেল।

দক্ষিণ ভারতে মহীশূর একটি বিখ্যাত ও বড় রাজ্য; ব্যাঙ্গালোর তাহার রাজধানী। বিস্তৃত ময়দানের উপর বিশাল রাজপ্রাসাদ দূর হইতে একখানি ছবির মত দেখাইতেছিল।

প্রাসাদের ফটকে মৃতদেহটি রাখিয়া মহারাজকে সংবাদ দেওয়া হইল। সৌম্য সুদর্শন মহারাজ একটু পরেই উপস্থিত হইলেন। স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল, সাহেবের শোচনীয় অবস্থা মহারাজকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে।

মহারাজের উপদেশ অনুসারে সাহেবের কোটপ্যাণ্ট, তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল। তাহাতে পাওয়া গেল, সাহেবের আত্মীয়-স্বজনের কয়েকটি নাম-ধাম ও ছোট একখানি পকেট-বই। পকেট-বইটি এক টুক্‌রা রবারের ফিতা দিয়া বাঁধা ছিল। ফিতা খুলিয়া ফেলিতেই ভিতর হইতে দুইখানি
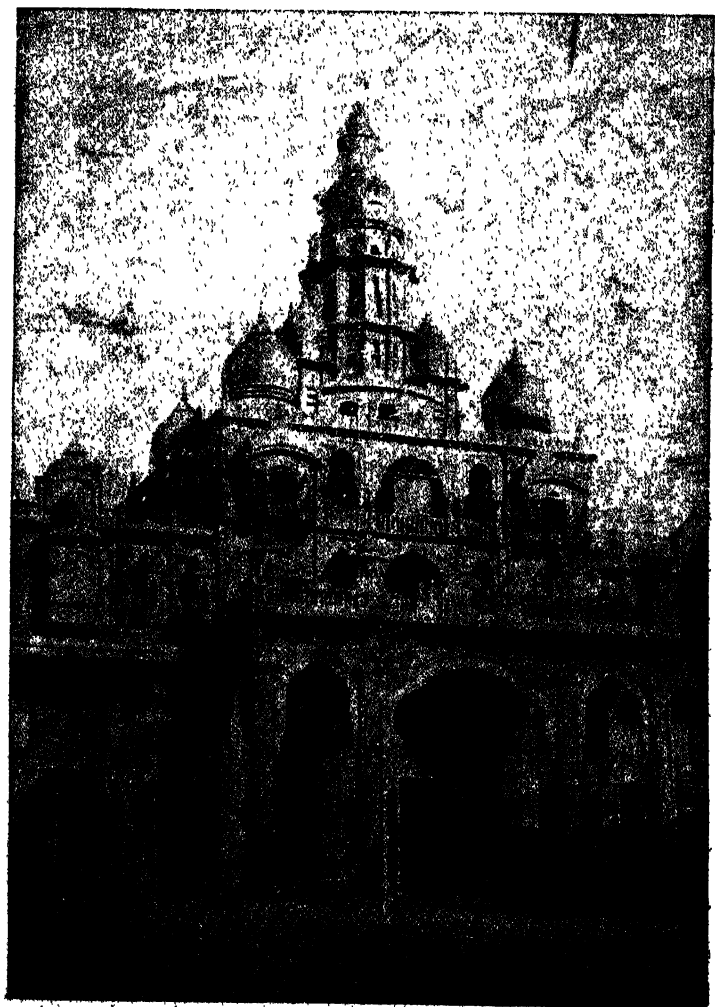
মহীশূরের রাজপ্রাসাদ

ছবি বাহির হইল। একখানি ছবির নীচে লেখা—"আত্মহত্যার জ্বলন্ত কুণ্ড", অপর ছবিখানির নীচে লেখা—"মিসেস্ আন্না মোনারো—উজ্জ্বল রমণী!"

প্রত্যেক ছবির সঙ্গেই তাহার একটু পরিচয় বা বর্ণনা লেখা আছে। অতি আগ্রহের সহিত একজন তাহা উচ্চস্বরে পড়িয়া ফেলিল।

'আত্মহত্যার জ্বলন্ত কুণ্ড'-টি জাপানের এক অভিনব দৃশ্য। অনেকগুলি ছোট বড় দ্বীপ লইয়া জাপান সাম্রাজ্য। জাপানের একটি দ্বীপের নাম 'ওশিমা'। দ্বীপটি ছোট, অতি নগণ্য। কিন্তু আকারে নগণ্য হইলেও সমগ্র জাপান সাম্রাজ্যে তাহা নিতান্ত কম বিখ্যাত নহে। 'ইয়োকোহামা' হইয়া জাপানে প্রবেশ করিতে এই দ্বীপটি সকলের চোখেই পড়ে। 'ওশিমা' দ্বীপে একটি আগ্নেয়গিরি আছে,—'মিহারা ইয়ামা'। 'মিহারা ইয়ামা' সর্ব্বদাই জাগ্রৎ - তাহা হইতে সর্ব্বদাই গলিত ধাতু ও গন্ধক ইত্যাদি বাহির হইতেছে।

জাপানে প্রতি বৎসর অনেক আত্মহত্যা হইয়া থাকে। তাহার অধিকাংশই হয় 'মিহারা ইয়ামা'য়। জাপানীদের বিশ্বাস 'মিহারা ইয়ামা' আত্মহত্যার পক্ষে অতি পবিত্র-স্থান। সেই ধারণায়, আত্মহত্যাকারিগণ এই আত্মহত্যা করিবার জন্য বিশেষভাবে লালায়িত হয়।

এই অন্ধবিশ্বাস দূর করিবার জন্য সম্প্রতি কয়েকজন পণ্ডিত (টোকিওর এক সংবাদপত্রের সাংবাদিক সম্প্রদায়) এক উত্তম

করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করেন যে, 'মিহারা ইয়ামা' যে অন্যান্য আগ্নেয়গিরির মত একটা সাধারণ আগ্নেয়গিরি মাত্র এবং তাহাতে যে অপর কোন বিশেষত্ব কিছুমাত্র নাই, তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা নিজেরাই দুই-একবার সেই জ্বলন্ত পাহাড়ের মধ্যে যাতায়াত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহারা একবার সেই 'মিহারা ইয়ামা'র গহ্বরে অবতরণ করিয়া তাহা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

তাঁহারা আগুনের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অ্যাস্‌বেষ্টসের তৈয়ারী পোষাক পরিয়া লইয়াছিলেন। তারপর ইস্পাতের তৈয়ারী একপ্রকার অপূর্ব্ব ঘর তাঁহাদিগকে বহন করিয়া উপর হইতে 'ক্রেন' বা কপিকলের সাহায্যে ধীরে ধীরে গহ্বরমধ্যে নামিতে লাগিল। সাড়ে বারো শত ফুট পর্য্যন্ত তাঁহারা নামিয়াছিলেন। ইস্পাতের ঘরে বসিয়া তাঁহারা আগ্নেয়গিরির কয়েকখানি ফটোও তুলিয়া আনিয়াছিলেন।

ইস্পাতের ঘরটির উপরদিক ছিল ক্রমশঃ সরু, এইরূপ ঘর 'গণ্ডোলা' নামে বিখ্যাত। গণ্ডোলায় বসিয়া তাঁহারা যখন ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিতেছিলেন, সেই সময় চারিদিকে প্রতি পাঁচ-সাত মিনিট পরেই মাঝে মাঝে যেন কামানের গর্জ্জন হইতেছিল। গহ্বরের দেয়ালে দেখা যাইতেছিল নানা রকম মিশ্র গলিত পদার্থ টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

প্রথমে প্রায় সাত শত ফুট নীচে এক মৃতদেহ দেখা গেল-
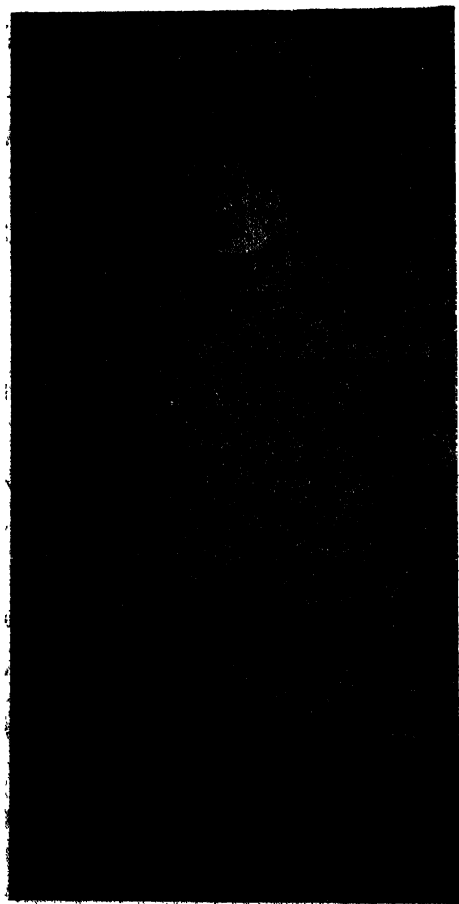
'গণ্ডোলা'

কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা উহা উদ্ধার করিতে পারিলেন না। যতই তাঁহারা নীচে নামিতে লাগিলেন, ততই চারিদিকে আরও মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন।

সাড়ে বারো শত ফুট নীচে নামিয়া তাঁহারা আর নীচে নামিতে সাহস করিলেন না। কারণ সেই কুণ্ডের মধ্যে তখন গলিত ধাতু এত বেগে নিঃসৃত হইতেছিল, আর গণ্ডোলাও এত দুলিতে লাগিল যে, আরও বেশী নীচে নামিবার চেষ্টা করা খুব বিপজ্জনক। সুতরাং তখনই তাঁহারা উপরে উঠিবার সঙ্কেত করিলেন। উপরে লোকজন সকলেই প্রস্তুত ছিল। সঙ্কেত পাওয়া মাত্র তাহারা তাঁহাদিগকে টানিয়া তুলিল।

'মিহারা ইয়ামা'র সেই ছবির নীচেই 'আত্মহত্যার জ্বলন্ত কুণ্ড' কথাটি এবং উহার বিবরণ লেখা রহিয়াছে। অপর ছবিটির নীচে লেখা 'মিসেস্ আন্না মোনারো—উজ্জ্বল রমণী'। অতি সংক্ষেপে 'আন্না মোনারো'র পরিচয়ও তাহাতে লিখিত রহিয়াছে।

'আন্না মোনারো' একটি স্ত্রীলোকের নাম—বয়স প্রায় ৪২ বৎসর হইবে। তিনি তাঁহার পবিত্র স্বভাব ও ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য বিখ্যাত। গভীর রাত্রিতে মিসেস্ মোনারো যখন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন, তখন অনেক সময় তাঁহার দেহ হইতে একটা অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পরীক্ষা করিয়াছেন।

তাঁহারা বলেন শ্বাস-প্রশ্বাসের স্পন্দনের সহিত ঐ অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয় এবং জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকবার মিসেস্ মোনারোর কণ্ঠ হইতে একটা কাতর গোঙানি শব্দ বাহির হইতে থাকে। কেন যে এই জ্যোতিঃ

'মিসেস্ আন্না মোনারো'

বিচ্ছুরিত হয়, অথবা কেন যে ইহা বন্ধ হয়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা স্থির করিতে পারেন নাই।

মিসেস্ মোনারোর শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি—প্রতি মিনিটে চব্বিশ বার। কিন্তু জ্যোতিঃ বাহির হইবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে তাঁহার সেই গতি হয় প্রতি মিনিটে আটচল্লিশ বার! তাঁহার নাড়ীর গতি সাধারণ অবস্থায় মিনিটে সত্তর বার,

কিন্তু জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইবার পরে হয় মিনিটে একশত চল্লিশ বার।

আন্না মোনারোর এই অদ্ভুত বিবরণ পড়িয়া সকলেই যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। মৃত সাহেবটি যে এসব অপূর্ব্ব তথ্য সংগ্রহ করিতেন ইহা বুঝিতে পারিয়া আমার বুকটাও যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু কঠিন তামার পয়সা আমি,—আমার কথা বলিবার শক্তি কোথায়? সুতরাং আনন্দ ও গৌরবের যে একটা প্রবল বন্যা আমার বুকের ভিতর বহিয়া যাইতেছিল, তাহা কিছুমাত্র প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

যাহোক্, মৃত ব্যক্তির পকেটে তাঁহার যে দুই-একজন আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় পাওয়া গেল, মহারাজ বাহাদুর সদয় হইয়া তাঁহাদের কয়েকজনের নিকট এই দুঃসংবাদ পাঠাইলেন এবং তাঁহারা না আসা পর্য্যন্ত মৃতদেহটি সযত্নে রক্ষা করিবার আদেশ দিলেন।

আত্মীয়-স্বজন আসিলে মৃতদেহটি তাঁহাদের হাতে সমর্পণ করা হইল। মৃত ব্যক্তির পকেট হইতে টাকা-পয়সার ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখিয়া, তাঁহাকে কবর দেওয়া হইল! মানিব্যাগের অন্যান্য টাকা-পয়সার সঙ্গে আমি আবার এক নূতন আশ্রয়ে উঠিলাম।

গভীর দুঃখের সহিত সাহেবের অন্তিম শয্যা বেশ করিয়া লক্ষ্য করিলাম। সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক,—কেবল দুঃসাহসের

জন্য অকালে প্রাণ হারাইল। ভূমিশয্যায় সাহেবকে চিরদিনের জন্য শোয়াইয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বিষণ্ণভাবে তাঁহাকে ফুলের মালা অঞ্জলি দিলেন।

সাহেবের নাম জর্জ্জ। ঐ নাম উচ্চারণ করিতেই তাঁহার ছোট বোন ইসাবেলার দুই চক্ষু হইতে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ইসাবেলা তাঁহার মানিব্যাগ হইতে একমুঠো টাকা-পয়সা বাহির করিয়া সাহেবের কবরের উপর স্থাপন করিলেন, তারপর তাঁহাকে শেষ অভিবাদন করিয়া অপর সকলের সঙ্গে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি একবারও ভাবিলেন না যে, একরাশ টাকা-পয়সার সঙ্গে তিনি আমাকেও সাহেবের কবরের উপরে রাখিয়া গেলেন!

মনে বড়ই দুঃখ হইল,—অভিমানে সমস্ত বুকটা ভরপুর হইয়া উঠিল। সাহেবের এত বড় দুঃসময়ে যে আমি তাঁহার একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলাম—কাবেরীর জলপ্রপাত যে আমার বুকেও তীব্রবেগে বহিয়া গিয়াছে!

কত চীৎকার করিয়া ডাকিলাম; কিন্তু পয়সার ভাষা লোকে বুঝিবে কেন? তাঁহারা সকলেই চলিয়া গেলেন, আমি কবরের উপরেই পড়িয়া রহিলাম।

কতক্ষণ ঐ ভাবে ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু অল্পক্ষণ হইলেও আমার নিকট তাহা অতি দীর্ঘ সময় বোধ হইতেছিল। অবশেষে দেখিলাম, ষণ্ডামত একটা লোক আসিয়া কবরের চারিদিকে কি অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

হঠাৎ কতকগুলি টাকা-পয়সা দেখিয়া লোকটির মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—সে আমাদিগকে কুড়াইয়া তাহার ট্যাঁকে গুঁজিয়া লইল।

লোকটির আড্ডা ছিল বেশ ভাল জায়গায়। ব্যাঙ্গালোরের নিকটেই টিপু সুলতানের দুর্গের পাশে ছোট্ট একখানি বাড়ী। লোকটি সেইখানে আরও কয়েকটি লোকের সঙ্গে বাস করিত। তাহারা সাধারণতঃ কুলী-মজুরের কাজ করিত, সুযোগ পাইলেই ছোট-খাট চুরি-ডাকাতি করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিত না।

টিপু সুলতান মারা গিয়াছেন বহুদিন পূর্ব্বে—১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে। টিপু সুলতান ও তাঁহার পিতা হায়দর আলির নাম উল্লেখ করিলে মহীশূরের যাবতীয় প্রজা—কি হিন্দু, কি মুসলমান—এখনও গৌরব অনুভব করেন।

পিতার মৃত্যুর পর টিপু সুলতান তাঁহার পিতার অসম্পূর্ণ কার্য্যে মন দিয়াছিলেন। ইংরেজদিগের সহিত হায়দর আলির প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষ চলিতেছিল, টিপু সুলতান তাহাতে হাত দিলেন।

টিপুর বীরত্বে অভিভূত হইয়া মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টকেও পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিভিক্ষা করিতে হইয়াছিল (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে)। কিন্তু পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিসের ভাষা ও কার্য্যকলাপে টিপু নিজেকে অপমানিত বোধ করিলেন এবং সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে ইংরেজদিগের এক মিত্ররাজ্য ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু টিপুর ভাগ্যলক্ষ্মী

তখন বিসর্জ্জনের পথে। সুতরাং টিপু যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনে সন্ধি হইল।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বীরগণের উল্লেখ করিতে হইলে টিপুর নাম উল্লেখ না করিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

টিপু সুলতানের দুর্গ-প্রাচীর

টিপুর পিতা হায়দর আলি এক হিন্দু রাজবংশের হাত হইতে মহীশূর রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু টিপু সুলতানের পতনের পর ইংরেজগণ মহীশূর রাজ্য সেই রাজবংশকেই ফিরাইয়া দিলেন। হায়দর আলি ও টিপু

সুলতানের ন্যায় অসাধারণ বীর ও প্রতাপশালী মুসলমান নৃপতির আধিপত্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল।

টিপু চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দুর্গ, দুর্গের সুদৃঢ় প্রাচীর ও প্রাসাদ আজও দাঁড়াইয়া আছে এবং সেই বীর-পুরুষের কীর্ত্তি সকলের নিকট জাগরূক রাখিয়াছে।

টিপু সুলতানের দুর্গ-প্রাচীরের নিকটেই আমার বাহন লোকটির আড্ডা। টিপুর বীরত্ব-কাহিনী তাহাদেরও অজ্ঞাত ছিল না। তাহারা সত্য, মিথ্যা, নানা কথায় টিপুর আলোচনা করিত, ইহা প্রায়ই শুনিতাম।

গভীর রাত্রি,—সকলেই ঘুমে বিভোর। হঠাৎ একটা চীৎকারে সকলেরই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। লোকজন প্রায় সকলেই সেই বস্তি হইতে বাহির হইয়া গেল,—সকলের মুখেই শব্দ হইতেছিল—"আগুন! আগুন!—"

বাহির হইল প্রায় সকলেই,—প্রায় সকলেই নিরাপদ্। কেবল আমি হতভাগা সেই জ্বলন্ত ঘরের মধ্যে তখনও চীৎকার করিতেছিলাম,—"রক্ষা কর,—বাঁচাও!—"

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি যাহার আশ্রয়ে ছিলাম. সেই হতভাগাও ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিতেছিল,—"ম'রে গেলুম, পুড়ে ম'লুম,—রক্ষা কর, বাঁচাও।"

—একটা জ্বলন্ত কাঠ তৎক্ষণাৎ সশব্দে লোকটির কাঁধে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

দশ

সেই নিদারুণ ঘটনার পরে আরও কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। কতদিন গিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কারণ, সেই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে আমার স্মৃতিশক্তির হ্রাস সম্ভবতঃ খুব বেশী পরিমাণেই হইয়াছিল। কেবল একটা কথা সর্ব্বদাই মনে হইত,—তাহা সে-দিনের আতঙ্কের কথা।

আমার সমস্ত শরীর একটা কঠিন ধাতুতে তৈয়ারী—আগ্নেয়গিরিতে আমার জন্ম—বহু বর্ষের বৃদ্ধ আমি,—কথাগুলি সবই সত্যি। তবু, স্বীকার করিতেই হইবে যে, সেই গভীর রাত্রির অগ্নিকাণ্ডের কথা আমি অবিচলিত ভাবে হজম করিতে পারি নাই।

পারি নাই, তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই। অমন একটা সাঙ্ঘাতিক অগ্নিকাণ্ড অনেকেই হাসিমুখে সহজভাবে উড়াইয়া দিতে পারে না। বিশেষতঃ জ্বলন্ত আগুনের তাপে যাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে, সে কি কখনও সেই আগুনের কথা ভুলিতে পারে?—কাজেই আমি আজও সে-কথা ভুলি নাই, অথবা তাহাকে অতি সহজ ও সরল-ভাবে উড়াইয়া দিতে পারি নাই।

—উঃ! কি ভীষণ সে আগুন!—গভীর রাত্রি, নিঝুম পৃথিবী। এমন সময় হঠাৎ সেই আগুন লাগিয়া দেখিতে

দেখিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটা পাড়া—একটা সমগ্র বস্তি—ভস্মের স্তূপে পরিণত হইয়া গেল।

আমি যাহার আশ্রয়ে ছিলাম, সে আর জীবনে তাহার ঘরখানি হইতে বাহির হইতে পারিল না। একটা জ্বলন্ত কাঠ তাহার কাঁধে ভাঙ্গিয়া পড়ায়, সেইখানেই—সে অগ্নিকুণ্ডের মাঝেই হতভাগার সমাধি হইয়া গেল! হতভাগা শেষ পর্য্যন্ত তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও বাহির হইতে পারিল না,—জিনিসপত্র ঘরবাড়ীর সঙ্গে, সে-ও পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল!

মৃত্যু আমার নাই—কঠিন উপাদানে আমার সমস্ত শরীর গঠিত। সুতরাং একমাত্র আমি সেই প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডের মধ্যেও অবিকৃত রহিয়া গেলাম।

অবিকৃত রহিল আমার দেহ; কিন্তু মনটা অবিকৃত রহিল কই? বিশেষতঃ, দুই-তিন দিন পরে যখন সেই অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানিতে পারিলাম, তখন ঘৃণা ও লজ্জায় আমার সমস্ত মনটা যেন শিহরিয়া উঠিল!—মানুষ এত জঘন্য, ইহা ভাবিতেও আমার দেহ-মন বিরক্তিতে পরিপূর্ণ হইল।

গভীর রাত্রিতে আগুন লাগিয়াছিল, আগুন নিভিল পরদিন ভোরবেলা! বৈকাল পর্য্যন্ত তাহা হইতে ধোঁয়া বাহির হইল, তারপর আগুনের আর চিহ্নমাত্র রহিল না। কেবল ইতস্ততঃ ছড়ানো জিনিসপত্র, আধপোড়া কাঠ-খড়, আর ভস্মস্তূপ পূর্ব্ব-দিনের সাঙ্ঘাতিক ঘটনার সাক্ষ্য দিতে লাগিল।

প্রাতঃকালে পুলিশ আসিয়া তদন্ত করিয়া গেল; একটা

লোক পুড়িয়া মারা গিয়াছে শুনিয়া দুঃখপ্রকাশ করিল;—সম্ভবতঃ পুলিশের কর্ত্তব্য সেইখানেই শেষ হইল।—আগুনের কারণ কি, তাহা নির্দ্ধারণ হইল না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আসিল তিনটি লোক। তাহাদিগকে দেখিয়াই আমার মনে কেমন একটা সন্দেহের উদয় হইল। অতি সাবধানে চারিদিকে চাহিয়া লোক তিনটি উপস্থিত হইল। তাহাদের একজন দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ,—অপর দুইজন ব্রাহ্মণ নহে, অন্য কোন জাতির লোক।

ব্রাহ্মণটি কহিলেন,—"দেখ্‌লি তো ব্যাপারখানা! আধ পয়সার এক দেশলাই-এর কাঠিতে এই ছোটলোকগুলোর চিহ্নমাত্র রাখা হয় নি।

হতভাগারা বড্ড বেড়েছিল। অনার্য্য, ম্লেচ্ছ, হরিজন—যত সব ছোটলোকের ছেলে,—তা'রা কিনা আমাদের সঙ্গে—ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাল্লা দিতে সাহস করে? আমরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাব, ওরা দেবে ছুঁয়ে! রাজ্যের যত বড় বড় সিপাহী-শাস্ত্রী, বড় বড় পণ্ডিত আছে, তা'রাও আমাকে সম্মান করে,—আর এরা দল বেঁধে সে-দিন আমাকে কি অপমানই না কর্‌লে! একবার ওরা ভাব্‌লে না যে, ওদের এই পাড়ার মোড়ল 'পন্থ্‌জি' নিজে সে-দিন কত বড় একটা দোষ করেছিল!

'পন্থ্‌জির' ছায়া—একটা ছোটলোকের ছায়া—আমার রান্নাঘরের ভিতরে যেয়ে পড়েছিল। তাই ত সে-দিন তা'কে কয়েকটা চড় বসিয়ে দিতে হ'ল। যেই পন্থ্‌জিকে দুটো চড়

মারা, আর অমনি দল বেঁধে এই পাড়ার ছোটলোকগুলো আমাকে তেড়ে মেড়ে এলো!—এখন ছাখ্ তার ফল। হতভাগাদের একদম ভিটেমাটি উচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছি!"

অপর এক ব্যক্তি কহিল,—"তা' ভালই করেছেন গুরুজি! কিন্তু শুনছি একটা লোক মারা গেছে,—এই যা দুঃখু।"

দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ

"ওঃ! ভারী তো দুঃখু—একটা ছোট-লোক মরেছে—উদ্ধার হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণের হাতে মরেছে,—লোকটা স্বর্গে চ'লে গেছে। এতে আবার দুঃখুর কি আছে?"—গুরুজি তাঁহার লম্বা লম্বা হাত দুইখানির সাহায্যে এই সহজ সত্য কথাটি শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।
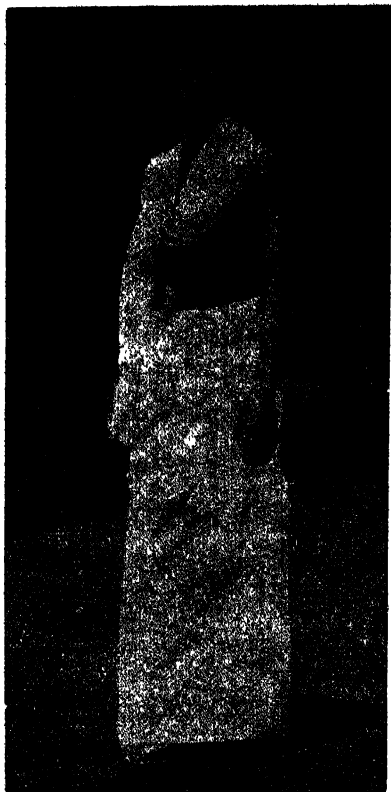
ঘৃণায় ও ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমি আমার নীরব ভাষায় তাঁহাকে শতবার অভিসম্পাত করিলাম, "উচ্ছন্ন যাও!"

ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে—উচ্চবর্ণ ও নীচবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে এমন ভীষণ বিদ্বেষ!—আর সেই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যাহারা মানুষকে আগুনে পোড়াইয়া মারিতেও কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না।

যা হোক আগুন লাগিবার প্রকৃত কারণটি তখন বুঝিতে পারা গেল। পুলিশ আসিয়া এত হৈ-চৈ করিয়াও যাহা জানিতে পারে নাই, তেমন একটা সত্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি ভাবিয়া একটা গৌরব অনুভব করিলাম।

সে অনুভূতি বেশীক্ষণ রহিল না,—গুরুজি হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া কুড়াইয়া লইলেন এবং একবার বেশ্ করিয়া দেখিয়া আমাকে তাঁহার কোমরে গুঁজিয়া ফেলিলেন।—সেই পিশাচ ব্রাহ্মণের স্পর্শে আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম।

* * *

আমার যত অনিচ্ছাই থাকুক না কেন, সেই পিশাচের সঙ্গেই আমাকে কাটাইতে হইল অনেক দিন।

তাঁহার প্রধান ব্যবসায় ছিল গুরুগিরি। এখানে সেখানে নানা বাড়ীতে ঘুরিয়া বার্ষিকী আদায় করা, আর বেশ্ আরামে দুইবেলা খাওয়া,—ইহাই ছিল তাঁহার দৈনিক কাজ। সুতরাং ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমিও দেশ-বিদেশ দেখিবার সুযোগ পাইতাম।

কিন্তু একদিন যাহা দেখিলাম তাহা যেমন অদ্ভুত, তেমনই আমোদজনক !

গুরুজি রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন,—কোন্ এক শিষ্য-বাড়ীতে যাইবেন,—আমি তাঁহার চাদরের এক কোণায় বাঁধা। হঠাৎ মনে হইল,—গুরুজি যেন আর চলেন না ! তিনি একটা বাড়ীর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন—তাঁহার চোখের পলক আর পড়ে না ! ব্যাপার কি ?—বড়ই কৌতূহল হইল,—দেখিতেই হইবে গুরুজি এমন চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন কেন ? গুরুজির দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমিও অবাক্ হইয়া গেলাম। দেখিলাম, একখানা মুখ—একটা বাড়ীর দরজা ফাঁক করিয়া গুরুজির দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

মুখখানি একটি স্ত্রীলোকের—অতি কচি মুখ—বেশ্ ধব্‌ধবে ফর্সা ! গলায় তাহার কতকগুলি অপরূপ অলঙ্কার ! কতকগুলি পিতলের আংটি—দেখিতে ঠিক হাতের বালার মত—সারি সারি সাজানো। তাহাতেই গলাটির আগাগোড়া জড়ানো। সেগুলি ঠিক্ কানের নীচ হইতে আরম্ভ করিয়া গলা ছাড়াইয়া—বুকের উপরেও অনেকটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পেছনে ঘাড়ের দিকে অপর কতকগুলি ছোট আংটি গলার এই অপরূপ বালাগুলিকে একসঙ্গে আটকাইয়া রাখিয়াছে।

পিতলের আংটিতে গলাখানি এমনভাবে ঢাকা যে, মেয়েটির আর মাথা উঁচু-নীচু করিবার শক্তি ছিল না। তাহাতে গলাটি

দেখাইতেছিল অতিরিক্ত লম্বা,—জিরাফের গলার মত। কানেও তাহার এক অদ্ভুত গহনা! দুইকানে দুইটি শিকল—বোধ হয় তাহাই মেয়েটির দুল! শিকলের অগ্রভাগে কতকগুলি সিকি দুয়ানী আঁটা।

মেয়েটির দিকে তাকাইয়া গুরুজির আর সখ মিটিতেছিল না। তিনি একদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

একখানা মুখ—একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে

মেয়েটিও সম্ভবতঃ এমন একটি ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি কখনও দেখে নাই। ব্রাহ্মণের সারা গায়ে চন্দন ও মাটির ছাপ, কপালেও

নানা চিত্র। বোধ হয় এমন চেহারা মেয়েটির কাছেও খুব নূতন। সুতরাং সে-ও ব্রাহ্মণের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল।

দেখিতে দেখিতে চারিদিকে আরও অনেক লোক জুটিয়া গেল—সেই বাড়ীর মালিকও আসিলেন।

তিনি বলিলেন—"মেয়েটির বাড়ী ব্রহ্মদেশের উত্তর অংশে। গলায় এমন অপরূপ বালা পরা এদের দেশের সৌন্দর্য্যের চিহ্ন। যার গলায় যত বেশী বালা, তা'কেই তত সুন্দরী মনে করা হয়! কেবল গলায় নয়, এদের পায়েও—গোড়ালী থেকে হাঁটুর নীচ পর্য্যন্ত—এমন ধরণের অনেকগুলি আংটি। কোন কোন মেয়ের গলায় এত আংটি থাকে যে, সেগুলোর ওজন হবে তেইশ-চব্বিশ সের, আর পায়ের আংটিগুলোর ওজনও পাঁচ-ছয় সের।

এরা রাত্তিরে শোবার সময়ও এসব আংটি প'রে শোয়। এগুলো খুলে ফেলাও এদের তখন অসাধ্য হ'য়ে পড়ে।

আপনারা অবাক্ হয়ে দেখ্‌ছেন কি? যদি ভাল ক'রে দেখ্‌তে হয়—আসুন আমার সঙ্গে। দেখ্‌বেন আরো তিনটি মেয়ে এসব আংটি প'রে কেমন নিশ্চিন্তে তাস খেল্‌ছে।"

ভদ্রলোকটি আহ্বান করিতেই গুরুজি তাঁহার সঙ্গে বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িলেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য লোকও বাড়ীতে প্রবেশ করিল। জানালা দিয়া দেখিলাম, তিনটি মেয়ে সেই রকম অলঙ্কার পরিয়া কেমন আরামে তাস খেলিতেছে!—ভদ্রলোকটি

বলিলেন,—"এরা এসেছে দেশ বেড়াতে। আজ ক'দিন এখানে আছে; দু'-এক দিনের মধ্যেই নিজেদের দেশে ফিরে যাবে।"

আমাদের দেখাশুনা অতি নিঃশব্দে শেষ হইল। ঐ মেয়েরা তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিল না।

কেমন আরামে তাস খেলিতেছে।

গুরুজি অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলিতে বলিতে সেখান হইতে বাহির হইলেন। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে চলিয়া তিনি এক খালের ধারে উপস্থিত হইলেন। কোন্ এক শিষ্যবাড়ীতে যাইবেন,—ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

গুরুজির সঙ্গে জিনিসপত্র অতি সামান্যই ছিল। সুতরাং ছোট্ট একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া তিনি তাহাতে চাপিয়া বসিলেন।

গুরুজির জিনিসপত্র তেমন কিছু লোভনীয় না হইলেও তাঁহার কোমরটি বেশ ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। কোমরে তাঁহার কতকগুলি টাকা-পয়সা! আমিও ছিলাম সেই সঙ্গে। কিন্তু আমারই ঠিক্ উপরে—গুরুজির এক শিষ্যের দেওয়া একটি

ছোট্ট নৌকায় গুরুজি চাপিয়া বসিলেন

মোহর তাঁহার কাপড়ের ভিতর দিয়াও ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিতেছিল। আর কেহ তাহা লক্ষ্য না করিলেও তাহা নৌকার মাঝিদের দৃষ্টি এড়াইল না। গুরুজিও হঠাৎ লক্ষ্য

করিলেন যে, একজন মাঝি তখনও তাঁহার কোমরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

ভয়ে গুরুজির বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি অন্যমনস্কভাবে একবার তাঁহার কোমরে হাত বুলাইয়া গেলেন।

তাঁহার কম্পিত হস্তের স্পর্শে সোনার মোহরও কাঁপিয়া উঠিল, আমিও কেমন কাঁপিয়া উঠিলাম। আমাদের উভয়ের দেহ-কম্পনে সম্ভবতঃ একটু অর্দ্ধস্ফুট শব্দ হইল, "টুং টুং !"—

গুরুজি তৎক্ষণাৎ আবার শিহরিয়া উঠিলেন। আমি অতি সাবধানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া লক্ষ্য করিলাম যে, মাঝিদের দুইজোড়া চক্ষু বাঘের চক্ষুর মত জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে।

একটা অজানা আশঙ্কায় আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম।

এগার

আশঙ্কা যাহা করিয়াছিলাম, কাজেও তাহাই হইল। লোকজনের বসতি পার হইয়া একটা নির্জ্জন স্থানে মাঝিরা নৌকা বাঁধিল।

গুরুজির বুকটা বোধ হয় দ্বিগুণ জোরে ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিল। তিনি শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে, তোমরা এখানে নৌকা লাগালে কেন ?"

মাঝিদের মধ্যে যে লোকটির বয়স একটু বেশী, সেই লোকটি কহিল,—"তোমার মুণ্ডু খাব, তাই নৌকা লাগিয়েছি।…নে রে সতা, শীগ্‌গির কর—লোকটাকে বেশ্ ক'রে ঝেড়ে-ঝুড়ে নে।"—বলিয়াই সে তাহার সঙ্গী মাঝিটিকে কি একটু সঙ্কেত করিল।

বুড়া মাঝির সঙ্কেতে অন্য মাঝিরা উঠিয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে গুরুজির মুখখানা চূণের মত সাদা হইয়া গেল,—আমার বুকটাও কাঁপিয়া উঠিল:

ছোট মাঝিটি কহিল,—"ও ঠাকুর! এবার লক্ষ্মীছেলের মত তোমার জিনিসপত্রগুলো আমায় দিয়ে দাও। তা' নৈলে বুঝ্‌তেই পারছ যে ব্যাপারখানা কেমন হবে,"—বলিয়াই সে একখানা প্রকাণ্ড দা বাহির করিল!

এক মুহূর্ত্তে গুরুজির সমস্ত রক্ত শুকাইয়া গেল, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া গেল,—তিনি হতাশভাবে এলাইয়া পড়িলেন। ছোট মাঝিটি—তাঁহার ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল,—"কি রে, দিবি তোর টাকা-কড়ি? না, দেব এক ঘা বসিয়ে?"

মাঝির হাতে তখনও সেই প্রকাণ্ড দা,—গুরুজির রক্তলোভে তাহাও যেন একবার নাচিয়া উঠিল। গুরুজি আর বৃথা বাক্য ব্যয় করিলেন না; কেবল একবার মাঝির পায়ে হাত দিয়া কহিলেন,—"দোহাই বাবা! আমি সব দিচ্ছি, কিন্তু আমায় প্রাণে মেরো না।"

অমন দুঃখেও আমার একটু হাসি পাইল, অতবড় প্রতাপশালী পরমপবিত্র গুরুজি আজ ঘটনাচক্রে একটা মাঝির পায়ে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছেন !

গুরুজির টাকাকড়ি, সোনারূপা সকলই মাঝিদের হাতে পড়িল, গুরুজির নিকট আর এক কপর্দ্দকও রহিল না। আমিও মাঝিদের অধিকারে আসিলাম।

হায়—হতভাগ্য গুরুজি ! গুরুজিকে একখানামাত্র ছেঁড়া গামছা পরাইয়া, তীরে নামাইয়া দেওয়া হইল ! তারপর পাল তুলিয়া নৌকাখানি মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

* * *

অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। আমি এখন একটা সাপুড়িয়ার সঙ্গে বাস করি। গুরুজির হাত হইতে প্রথমে মাঝির হাতে, সেখান হইতে এক দোকানদারের হাতে, সেই দোকানদারের হাত হইতে এক সাপুড়িয়ার হাতে,—এইভাবে আমার ভাগ্য-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

অদ্ভুত এই সাপুড়িয়াগুলি ! পৃথিবীর মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর, সেই বিষধর সাপগুলিকে লইয়া তাহাদের দিন আনন্দে কাটিয়া যায় ! সেই আনন্দে তাহাদের হৃদয় নাচিয়া উঠে, বাঁশীর তানে তাহারা বিষাক্ত সাপের বুকেও মাদকতা ঢালিয়া দেয় !

সাপের দারুণ বিষে পৃথিবী ঢলিয়া পড়ে—ঈশ্বরের সৃষ্টি অতলে ডুবিয়া যায়। এত উগ্র, এত তীব্র সেই বিষ ! কিন্তু

শুনিলাম, মানুষের বুদ্ধি সেই তীব্র হলাহলও অমৃতে পরিণত করিতেছে!

শুনিলাম, রাসেল্ প্রভৃতি কোন কোন বিষধর সর্পের বিষ হইতে একপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। একটা কাঁচের পাত্রের মুখটি রবারের আবরণে ঢাকিয়া সাপকে তাহাতে দংশন

সাপের বিষ লওয়া হইতেছে

করানো হয়। সাপের দংশনে বিষ বাহির হইয়া অতি সূক্ষ্ম-ভাবে সেই পাত্রে প্রবেশ করে। তারপর তাহাকে নানা রাসায়নিক উপায়ে শুষ্ক করিয়া একপ্রকার হল্‌দে গুঁড়ায় পরিণত করা হয়। সেই হল্‌দে গুঁড়াগুলিকে তখন আরও কতকগুলি প্রক্রিয়ায় ঔষধে পরিণত করা হয়। 'হিমো-ফাইলিয়া' নামক সাংঘাতিক ব্যারামের উহা অতি চমৎকার মহৌষধ।

সাপুড়িয়ার সঙ্গে কাটিল আমার অনেকদিন। বেচারী সাপুড়িয়ার খরচ অতি সামান্য। সুতরাং অনেকদিন পর্য্যন্ত আমার গায়ে কোন হাতই পড়িল না। ভাবিয়াছিলাম, কৃপণের হাতে হয়ত আমার সারাজীবন একটানা নিশ্চিন্তভাবেই কাটিয়া যাইবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার সেই সুখ-স্বপ্ন ঘুচিয়া গেল—দৈবাৎ আমি এক কুলীর হাতে আশ্রয়লাভ করিলাম।

দরিদ্র কুলী—দিনরাত পরিশ্রম করিয়া কোনরূপে তাহার রুটি জোগাড় করে। তাহার দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ উপলব্ধি করিয়া আমি মাঝে মাঝে আত্মহারা হইয়া পড়িতাম। বেচারার কত অভাব! তবু সে আমাকে বাঁচাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছে! হাতে যে-দিন আর পয়সা থাকিত না সে-দিন সে উপবাস করিত, তবু আমার বিনিময়ে এক পয়সার ছাতু খাইয়া সে পেট পূরিবার চেষ্টা করে নাই!

মহীশূরের রাজধানী ব্যাঙ্গালোর। ব্যাঙ্গালোরের অনেকটা দূরে এক সহর আছে,—তাহার নাম 'বেলুড়'। নানা জায়গায় ঘুরিয়া ফিরিয়া কুলীটি একদিন এক সাহেবের সঙ্গে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইল। মোটরগাড়ী হইতে সাহেবের মালপত্র-গুলি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কুঠীতে পৌঁছাইয়া দিয়া কুলীটি যে পারিশ্রমিক পাইল, তাহাতে তাহার মুখে একটা অপূর্ব্ব হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কাপড়ের খুঁটে টাকা-পয়সাগুলি বেশ্ করিয়া বাঁধিয়া লইল; তারপর আবার কোন কাজের আশায় বেলুড়-মন্দিরের পাশে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।
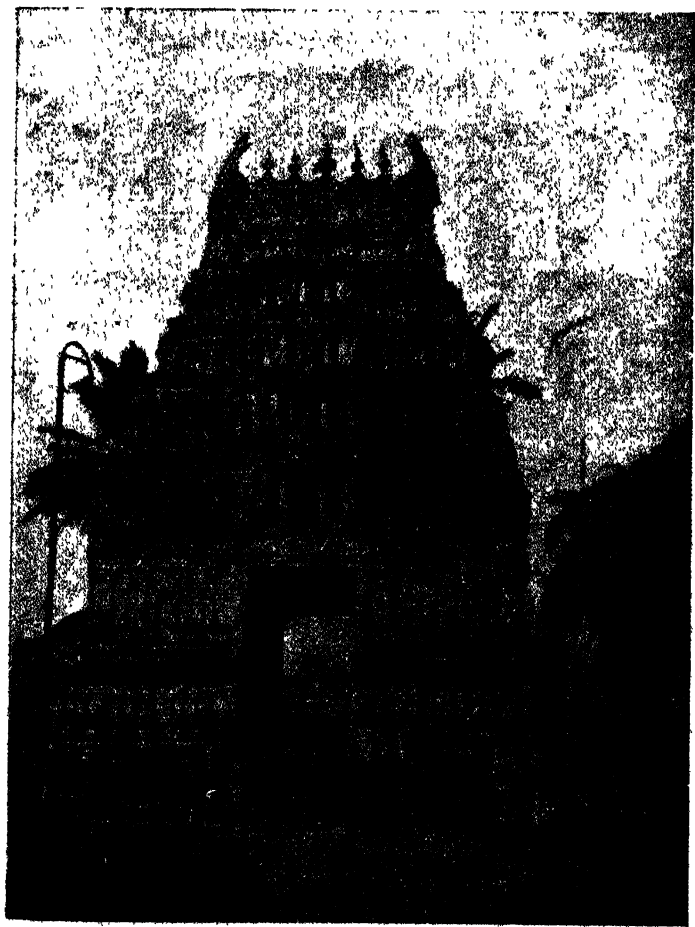
বেলুড়-মন্দির (পূর্ব্বদিকের প্রবেশ-পথ)

বেলুড়ে প্রধান মন্দির একটি; কিন্তু আশেপাশে ছোট ছোট আরও কতকগুলি মন্দির আছে। সবগুলির চারিদিকে দেয়াল, মাঝখানে বিশাল আঙ্গিনা।

বেলুড়ের প্রাচীন নাম ভেলাপুরা, ভেলাপুরা হইতে ভেলুর, ও তাহা হইতেই বেলুড় নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বহু বৎসর পুর্ব্বে দক্ষিণ-ভারতে যখন হোয়্সল-বংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন এই বেলুড় ছিল তাঁহাদের রাজধানী। সম্ভবতঃ ১১১৭ খৃষ্টাব্দে হোয়্সল-বংশের বিখ্যাত রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু আচার্য্য রামানুজ তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিবার পর এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

বেলুড়ের প্রায় সতেরো মাইল দূরে হেলীবিদ্ সহর। সেখানেও কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির আছে। বেলুড় ও হেলীবিদ্—সর্ব্বত্রই মন্দিরগুলি প্রাচীন ভারতের অসাধারণ শিল্পকলার পরিচয় দিতেছে। বেলুড়ের মন্দির হেলীবিদের মন্দিরের অপেক্ষা বেশী প্রাচীন এবং সোমনাথপুরের মন্দির হইতেও ইহা বেশী পুরাতন।

রাঁচি হইতে দুইজন সাহেব এই সকল মন্দির পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। আমার বাহন কুলীটি সেই সাহেব-দিগের মোট লইয়া তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিল। হেলীবিদের কেদারেশ্বর-মন্দির দর্শন করিয়া সাহেব দুইজন

নিকটবর্ত্তী এক ডাকবাংলায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। ডাকবাংলায় পৌঁছিয়া একজন সাহেব কুলীকে একটি টাকা দিয়া কহিলেন,—"বারো আনা রাখ, চার আনা ফেরৎ দাও।"

কুলী তাঁহাকে চারি আনা ফেরৎ দিল। কিন্তু সে একবারও লক্ষ্য করিল না যে, ঐ চারি আনা পয়সার সঙ্গে আমাকেও তাঁহার হাতে সমর্পণ করিল।

আমি কুলীটিকে এত ভালবাসিতাম; কিন্তু সে তো আমাকে পরিত্যাগ করিতে একবারও ইতস্ততঃ করিল না! কুলীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঐখানেই শেষ হইল।

কয়েকদিন আর উল্লেখযোগ্য কোন ব্যাপার না থাকিলেও আমার শান্তি ছিল না একেবারেই। সাহেবগুলি ত আর চুপ্-চাপ্ বসিয়া ছিলেন না, ক্রমাগতই দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

কয়েকদিন পরে আমরা বোম্বাই সহরের প্রায় আশী মাইল দূরে প্রতাপগড়ের দুর্গের নিকটে উপস্থিত হইলাম। অদূরে প্রতাপগড়ের পর্ব্বতশ্রেণী শোভা পাইতেছিল। একজন সাহেব কহিলেন,—"মিষ্টার জেম্‌স্! এই দেখুন, সেই প্রতাপগড়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মারাঠা-বীর শিবাজীর দুর্ভেদ্য দুর্গ এই প্রতাপগড়েই অবস্থিত।

একটা গল্প আছে যে, দুর্গটিকে সব রকমে সুরক্ষিত ক'রে শিবাজী ঘোষণা ক'রে দিয়েছিলেন, যে কেউ এর ভিতরে গোপনে প্রবেশ করতে পারবে, তা'কে একটি সোনার বালা

পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের লোভে অনেকেই চেষ্টা করেছিল; কিন্তু কেউ পারে নি। অবশেষে একটা স্ত্রীলোক দুর্গের ভিতর ঢুকেছিল। শিবাজী তা'কে পুরস্কার দিলেন এবং জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নিলেন, দুর্গের কোথায় গলদ আছে। তারপর দুর্গকে আবার নূতন ক'রে সুরক্ষিত করা হ'ল।"

শিবাজীর দুর্গ—প্রতাপগড়

জেম্‌স্‌ সাহেব বলিলেন,—"এই শিবাজীকেই না কেহ কেহ 'মারাঠা ডাকাত' বলে?"

অপর সাহেবটি বলিলেন,—"হাঁ। তা' যে যাই বলুক্‌ না কেন, শিবাজী একজন আদর্শ বীর ও আদর্শ রাজা ছিলেন তা'তে কোন সন্দেহ নেই। শিবাজীর বীরত্ব,—শিবাজীর অসাধারণ বুদ্ধি ও যুদ্ধকৌশল,—স্ত্রীলোক, শিশু ও দুঃখীর প্রতি শিবাজীর

উদার ব্যবহার,—যে কোন জাতির পক্ষে অতিমাত্র গৌরবের বিষয়। সম্রাট্ আওরংজেব, শিবাজীর রণকৌশলে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'পার্ব্বত্য মূষিক' উপাধি দিয়েছিলেন। এক সময় শিবাজীর বাবা সাহজীকে বিজাপুরের সুলতান কারারুদ্ধ করে-ছিলেন। শিবাজী তার প্রতিশোধস্বরূপ বিজাপুর-সুলতানের জাওলি প্রদেশ হস্তগত করেন।"

হঠাৎ গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা অস্পষ্ট শব্দ হইল। উভয়ে সেদিকে চাহিতেই যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

তাঁহারা দেখিলেন, একটা প্রকাণ্ড বাঘ তাহার লেজটি পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া সোজা দাঁড়াইয়া আছে;—সাহেবদের রক্তলোভে তাহার প্রাণটি বোধ হয় নাচিয়া উঠিয়াছিল।

সাহেবদের সঙ্গে বন্দুক পিস্তল কিছুই নাই। নিরস্ত্র ভাবে —হঠাৎ অতর্কিতে এমন একটা বিপদ দেখিয়া তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। সম্মুখের সাহেবটি তাঁহার হাতে যাহা কিছু ছিল, সে সমস্তই প্রচণ্ডবেগে বাঘের দিকে নিক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে একদিকে ছুটিয়া পলাইলেন। অপর সাহেবটিও প্রাণভয়ে একটা বিকট চীৎকারে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহার পূর্ব্বগামী সাহেবটিকে অনুসরণ করিলেন।

সাহেবের নিক্ষিপ্ত জিনিসপত্রের সঙ্গে একটা রেশমের থলিয়াও ছিল। সেই থলিয়ার মধ্যে থাকিয়া আমি এতক্ষণ তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলাম।

বাঘের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কেহ তাহাকে কিছু নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইবে, বাঘ বোধ হয় এমন ধারণা কখনও করে নাই।—এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় সে উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং সেই মুহূর্ত্তে শূন্যে লম্ফ প্রদান করিয়া নিক্ষিপ্ত জিনিসগুলিকেই আক্রমণ করিল। আকারে বড় বলিয়া অন্যান্য জিনিসপত্রের
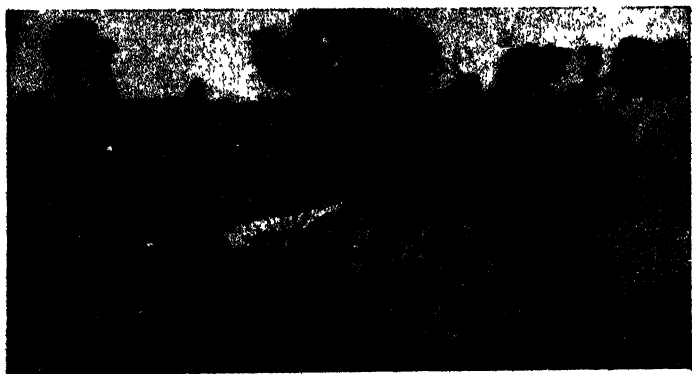
বাঘটি ঘাসের উপর আরামে ঘুমাইয়া আছে

কোন অনিষ্ট হইল না; সেগুলি বাহিরেই পড়িয়া রহিল, কিন্তু আমি ছিলাম সেই রেশমের থলিয়ার মধ্যে। কাজেই থলিয়া-শুদ্ধ আমি তীব্রবেগে বাঘের মুখের মধ্যে ছুটিয়া পড়িলাম।

আর সাহেব দুইজন কি করিলেন? তাঁহারা সেই মুহূর্ত্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে যাইয়া হঠাৎ কোন্ এক গহ্বরে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

বাঘের মুখে থাকিয়াই আমি ইহা লক্ষ্য করিলাম। বাঘটি

সম্ভবতঃ তাঁহাদের মাথার উপর দিয়াই—তাঁহাদিগকে ডিঙ্গাইয়া গহ্বরের অপর ধারে—বহুদূরে যাইয়া পড়িল।

বাঘের মুখে! ইহা বুঝিতে পারিয়াই আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম, জানি না। জ্ঞান হইলে দেখিলাম, বাঘটি ঘাসের উপর বেশ আরামে ঘুমাইয়া আছে। তাহার সম্মুখের থাবার নিকটেই থলিয়াটি খোলা পড়িয়া রহিয়াছে।

আর আমি?—আমি তাহার মুখেরই কাছে—অতি কাছে ঘাসের মধ্যে শুইয়া রহিয়াছি,—বাঘের চোয়ালের কতকটা অংশ আমাকে চাপিয়া প্রায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তাহার উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ আমাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিল।

আমি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

বার

"গুম্—গুম্—গুড়ুম্!"—

বন্দুকের উপর্য্যুপরি কয়েকটি শব্দে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইল; সম্ভবতঃ তাহাতেই আমি সংজ্ঞা লাভ করিলাম। তৎক্ষণাৎ আবার একটা বিকট হুঙ্কারে চারিদিক্ কাঁপিয়া গেল—পশুপক্ষী সকলেই আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

প্রবল গর্জ্জন করিয়া বাঘ তাহার শিকারীদের উদ্দেশ্যে

লম্ফ প্রদান করিল; কিন্তু শিকারীদের অব্যর্থ লক্ষ্যে আহত হইয়া অর্দ্ধপথেই ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল,—তাহাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারিল না।

বন্দুকের শব্দে ও বাঘের গর্জ্জনেই আমি স্তব্ধ হইয়াছিলাম,—পরক্ষণেই শূন্যপথে বাঘের বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম,—আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

বাঘ মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেই আবার ভীষণ শব্দে বন্দুক গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"গুড়ুম্—গুম্"—আর একবার ব্যাঘ্র-গর্জ্জনে চারিদিক্ কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণেই ব্যাঘ্র তাহার শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চিরদিনের জন্য নীরব হইল। মহা উল্লাসে শিকারীরা ছুটিয়া গেল এবং দড়িদড়া বাঁধিয়া বাঘটিকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিল।

আমি তখনও সেই মুখখোলা রেশমের থলিতে নিঃশব্দে বসিয়া সমস্ত ব্যাপারটি আগাগোড়া লক্ষ্য করিতেছিলাম। হঠাৎ শিকারীদের একজন আমাকে অথবা রেশমের থলিটিকে দেখিতে পাইল এবং আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"হাঁরে, দেখ্—দেখ্! ঐ কি একটা প'ড়ে আছে!"

কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমার ঘাড়ের উপর প্রায় ছুটিয়া আসিল এবং রেশমের থলিশুদ্ধ আমাকে কুড়াইয়া লইয়া কহিল,—"বেশ্ তো মজার ব্যাপার দেখ্ছি!—একটা রেশমের থলি, তার মাঝে কতকগুলি টাকা-পয়সা! বাঘ-মশাই তো এইখানেই ছিলেন মনে হয়। তিনি তো এখান

থেকেই আমাদের দিকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। বনের বাঘ, তিনি আবার এসব টাকা-কড়ির মালিক হলেন কি ক'রে?"

"সে কি জানিস্ নে তুই! যে বনে সিংহ নেই, বাঘই সেখানে রাজা। রাজা-মশাই তাঁর টাকা-পয়সা বা'র ক'রে হিসাব কষছিলেন!"—একগাল হাসি লইয়া দ্বিতীয় শিকারী সঙ্গীকে এই জবাব দিল। এই জবাবে চারিদিকে একটা হাসির ফোয়ারা ছুটিল।

তারপর,—অনেক গবেষণা হইল, অনেক জল্পনা-কল্পনা হইল; কিন্তু কেহই স্থির করিতে পারিল না যে, বনের বাঘ—তার কাছে আবার টাকা-পয়সাশুদ্ধ রেশমের থলি কেমন করিয়া আসিল। যাহোক্ সেই দিন হইতে আমি এক শিকারীর পকেটেই স্থান পাইলাম এবং সেই ভাবেই কাটিল অনেক দিন।

ধীরে ধীরে শিকারীর পরিচয় পাইলাম। বাড়ী তাঁহার ফ্রান্সে—প্যারিস্ সহরে। প্যারিসের এক সমৃদ্ধিশালী অংশে তাঁহার বিশাল প্রাসাদ ছিল। কিন্তু বছর দুই হয়, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছে,—মাথা গুঁজিবার মত সামান্য একটু আশ্রয়ও আর নাই। তাই সর্ব্বস্ব হারাইয়া তিনি ভারতে আসিয়াছেন ভাগ্য অন্বেষণ করিতে।

শুনিলাম, ফ্রান্সের অধিকাংশ সহর ফাঁকার উপর অবস্থিত। সেই সব সহরের তলায় শত শত মাইল বিস্তৃত কেবল কাদা, চূণ পাথর ও 'প্যারিস্-প্ল্যাষ্টার' নামক একরকম কাদা-জাতীয়

পদার্থ। সহরের তলায় এই সব অপূর্ব্ব জিনিসের খনি থাকায় সহরের ভিত্তি একেবারেই শক্ত নহে। যে কোন মুহূর্ত্তে উপরের দুই-একটি বাড়ীঘর ধ্বসিয়া পড়িতে পারে।

কয়েকবার সাঙ্ঘাতিক কয়েকটি দুর্ঘটনা হওয়ায় এখন অনেক আইন-কানুন হইয়াছে। 'প্যারিস্-প্ল্যাষ্টার' ও পাথর-চূণের খনিগুলি খুঁড়িবার বা মেরামত করিবার সময় এখন অনেক সতর্ক হইতে হয়। কিন্তু এত সাবধানতায়ও মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা হইয়া থাকে। হতভাগ্য শিকারীর বহুমূল্য প্রাসাদও এইরূপে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য তাঁহাকে চারিদিকে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

শিকারীর সঙ্গে বনে বনে পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘুরিয়া আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। একটা পরিবর্ত্তন বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আমার প্রাণটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। যাহোক্ একদিন তাহার সুযোগ জুটিয়া গেল। স্থির হইল, আমার বাহন শিকারীটি কি একটা কাজে রামেশ্বরম্ যাইবেন।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে 'রামেশ্বরম্'। রামেশ্বরম্ একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ। চারিদিকে অনন্ত মহাসাগর। দক্ষিণ-ভারতের 'মণ্ডপম্' ষ্টেশন হইতে একটা শাখালাইনে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। কুমারিকা হইতে ষ্টীমারে কয়েক মাইল সমুদ্র পার হইলেই লঙ্কাদ্বীপ। কুমারিকা অন্তরীপ ও লঙ্কাদ্বীপের মধ্যপথে সমুদ্রবক্ষে রামেশ্বরম্ দ্বীপ মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে।

রামেশ্বরম্ ষ্টেশনে নামিয়া শিকারীটি এক হোটেলে বিশ্রাম

করিয়া লইলেন। তারপর সেখানে স্নান শেষ করিয়া মন্দির দর্শনে চলিলেন।

দূর হইতেই দেখিলাম মন্দিরের অপরূপ সৌন্দর্য্য ;—

রামেশ্বরের মন্দির

দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারিলাম না, মন্দিরের সম্মুখে বিস্তৃত

রাজপথ, তাহার দুইপাশে মাঝে মাঝে নারিকেল গাছের সারি। মন্দিরের গায়ে অপরূপ কারুকার্য্য।

ভাবিলাম, বাহিরেই যাহার এত সৌন্দর্য্য, ভিতরে তাহার হয়ত আরও কত অতুলনীয় শোভা! ভিতরে প্রবেশ করিয়া বুঝিলাম, আমার ধারণা মিথ্যা নয়—প্রকৃতই অতি সত্য।

বিশাল মন্দির—তাহার দুই দিকে অসংখ্য স্তম্ভরাজি শোভা পাইতেছে। উপরে ছাদের নিম্নদিকে অপূর্ব্ব কারুশিল্প। কক্ষটিকে আলোকিত রাখিবার জন্য তাহাতে সর্ব্বদা উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে।

প্রায় তিন মাইল জুড়িয়া মন্দির। তাহাতে বিস্তৃত চত্বর, প্রাঙ্গণ, আর দেবদেবী যে কত দেখিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। তবে, প্রধান মূর্ত্তি দুইটি। একটি হনুমানের প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি, আর একটি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি।

একই মন্দিরে দুইজনের প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি কেন? শুনিলাম, রাবণকে হত্যা করায়, পণ্ডিতেরা বলিয়াছিলেন যে শ্রীরামচন্দ্রের ব্রহ্মবধের পাপ হইয়াছে। তাঁহারা ব্যবস্থা দিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র যদি কোন শুভ মুহূর্ত্তে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তবেই তাঁহার পাতক দূর হইবে।

শ্রীরামচন্দ্র আর কি করেন? তিনি তৎক্ষণাৎ হনুমানকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাছা হনুমান! নর্ম্মদা নদীতে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি আছে। তুমি সে মূর্ত্তি এখানে নিয়ে এসো। কিন্তু মনে রেখো, ঠিক আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসা চাই।"

হনুমান্ মূর্ত্তি আনিতে গেলেন, কিন্তু তিনি আর ফিরিয়া আসেন না, অথচ শুভলগ্ন চলিয়া যায়। অন্য উপায় না দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র বালি দিয়া এক লিঙ্গমূর্ত্তি প্রস্তুত করিলেন এবং যথাসময়ে সেই বালির মূর্ত্তিটিরই প্রতিষ্ঠা করা হইল। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লিঙ্গমূর্ত্তির নাম হইল রামলিঙ্গম্ বা রামনাথ, এবং সেই স্থানের নাম হইল রামেশ্বরম্।

মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা হইল বটে, কিন্তু পরদিনই হনুমান্ এক লিঙ্গমূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র এক বালির মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং তাঁহার আনীত মূর্ত্তির আর আবশ্যকতা নাই,—তখন তিনি একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি রাগে আগুন হইয়া কহিলেন,—"বটে! এত আস্পর্দ্ধা! আমাকে অপমান! আমার আনীত মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হ'ল না, প্রতিষ্ঠা হ'ল এক বালির মূর্ত্তির!—আচ্ছা, দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!"—বলিয়াই তিনি গেলেন সেই বালির মূর্ত্তিকে টানিয়া ফেলিতে। কিন্তু অত বড় বীর হইলেও তিনি সেই বালির মূর্ত্তিকে নাড়িতেও পারিলেন না!

যাহোক্, শ্রীরামচন্দ্র একটু হাসিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—"বাছা হনুমান্! তুমি রাগ ক'রো না। আমি তোমার এই মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা ক'রে নেব, তা'র নাম হবে হনুমানলিঙ্গম্। আর আমার আদেশে এখন থেকে তোমার এই মূর্ত্তির পূজাই হবে সকলের আগে,—আমার মূর্ত্তির পূজা হবে তার পরে।"

শ্রীরামচন্দ্রের ব্যবস্থায় হনুমান্ খুব সন্তুষ্ট হইলেন। সেই হইতে ঐরূপ ব্যবস্থাই চলিয়া আসিতেছে।

মন্দিরের ভিতরে স্তম্ভের পাশে পাশে এবং লিঙ্গমূর্ত্তির দুই ধারে পাথরের যে সকল ভক্তমূর্ত্তি আছে, তাহা অনেকাংশে হনুমানেরই প্রতিমূর্ত্তি মাত্র। হনুমান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান ভক্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই কারণেই এমন ব্যবস্থা।

রামেশ্বরম্ হইতে রেল লাইন গিয়াছে ধনুষ্কোটি পর্য্যন্ত। শুনা যায় যে, লঙ্কাযুদ্ধের পরে সীতার উদ্ধার হইলে সমুদ্রের দেবতা আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন,—"প্রভো! যুদ্ধে আপনি জয়লাভ করেছেন, রাবণ নিহত হয়েছে, সীতারও উদ্ধার হয়েছে। তবে এখন আর আমাকে এমন বন্ধন-দশায় রাখেন কেন? পাহাড়-পর্ব্বত, গাছ-পাথর দিয়ে এই যে সেতু তৈরী করেছিলেন, এখন দয়া ক'রে তা' ভেঙ্গে দিন্ প্রভো! এই বন্ধন-দশা হতে আমার মুক্তি হোক্।"

শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার ধনুকে তীর যোজনা করিয়া তৎক্ষণাৎ একবাণে সেই সেতু ভাঙ্গিয়া উড়াইয়া দিলেন। সেইজন্য ঐ স্থানের নাম হইয়াছে ধনুষ্কোটি।

রামেশ্বরম্ দ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা গল্প শুনা যায়।

লঙ্কাযুদ্ধে লক্ষ্মণ একবার ভীষণরূপে আহত হইয়া পড়েন। তখন বৈদ্য আসিয়া পরামর্শ দিলেন,—"বি-শল্য-করণী গাছ নিয়ে এসো, লক্ষ্মণকে ভাল ক'রে দিচ্ছি। এই রাতের মধ্যেই তা' এনে দিতে হবে, নতুবা রক্ষা নেই।"

হনুমান্ চলিলেন ; বি-শল্য-করণী আনিতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু গাছ চিনিতে পারিলেন না। এদিকে রাত্রিও শেষ হইয়া যায়। সুতরাং সমস্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতটাই তিনি মাথায় করিয়া লইয়া আসিলেন! লক্ষ্মণ সুস্থ হইলেন। সেই পর্ব্বতটাকে কি করা যায়, তখন সেই হইল একটা প্রশ্ন। আবার কাঁধে করিয়া সেটাকে লইয়া যাওয়া হনুমান্ পছন্দ করিলেন না। তিনি পর্ব্বতটাকে ছুঁড়িয়া দিলেন! ভাবিয়াছিলেন —পর্ব্বতটি ঠিক্ স্থানেই যাইয়া পৌঁছিবে, কিন্তু তাহা হইল না। পর্ব্বতটি যাইয়া পড়িল সমুদ্রের মধ্যে। অত বড় গন্ধমাদন পর্ব্বত সমস্তটা ডুবিয়া গেল না, কতকটা অংশ সমুদ্রের উপর ভাসিয়া রহিল। তাহারই নাম হইয়াছে রামেশ্বরম্ দ্বীপ।

রামেশ্বরম্ দর্শন শেষ করিয়া শিকারীটি মাদুরায় আসিলেন। সেখানে আসিয়া মাদুরার মন্দির দর্শনে রওয়ানা হইলেন।

বহু-বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া মাদুরার মন্দির। চারিদিকে উচ্চ দেয়াল। মন্দিরটি সবই পাহাড়ে প্রস্তুত। এখানেও মন্দিরের ভিতরে জমাট অন্ধকার।

শুনিলাম, মাদুরা সহরের পূর্ব্ব নাম কদম্ব-বন। কোন সময় এখানে নাকি অসংখ্য কদম্ব গাছ ছিল। মন্দিরের পাশে এখনও একটা কদম্ব গাছ সযত্নে রক্ষা করা হইতেছে। মাদুরা সহরে দর্শনীয় বস্তু অসংখ্য। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা কেহ কেহ উহার নাম দিয়াছেন 'ভারতবর্ষের এথেন্স্'! তামিল ভাষায়

একটা প্রবাদ আছে যে, "জীবনে যে কখনও মাছুরা দেখে নাই, সে পরজন্মে গাধা হইয়া জন্মগ্রহণ করে।"

মাছুরায় কয়েকদিন কাটাইয়া আমরা নানা দর্শনীয় বস্তু দেখিতে লাগিলাম,—মাছুরার স্বর্ণ-মন্দির, তিরুমলয় নায়েকের
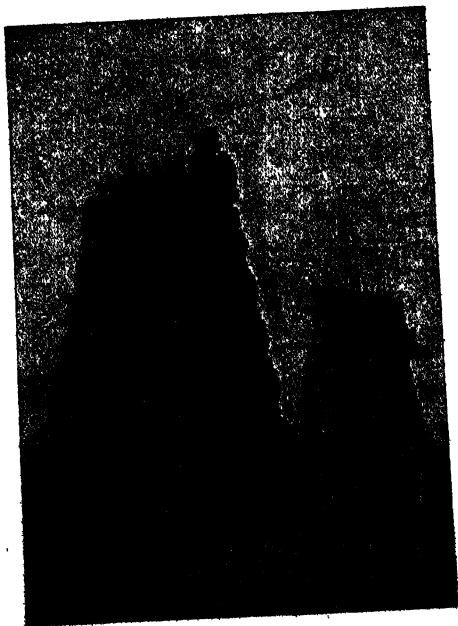
মাছুরার মন্দির

প্রাসাদ, টেপাকুলম্ সরোবর ইত্যাদি অনেক কিছুই দেখিলাম। যত দেখিতে লাগিলাম ততই আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে লাগিল,—মাছুরার সৌন্দর্য্যে আমরা মুগ্ধ হইলাম।

একদিন শিকারীর সখ হইল, তিনি টেপাকুলম্ সরোবরে স্নান করিবেন। তাই ভোর না হইতেই তিনি সেখানে স্নান
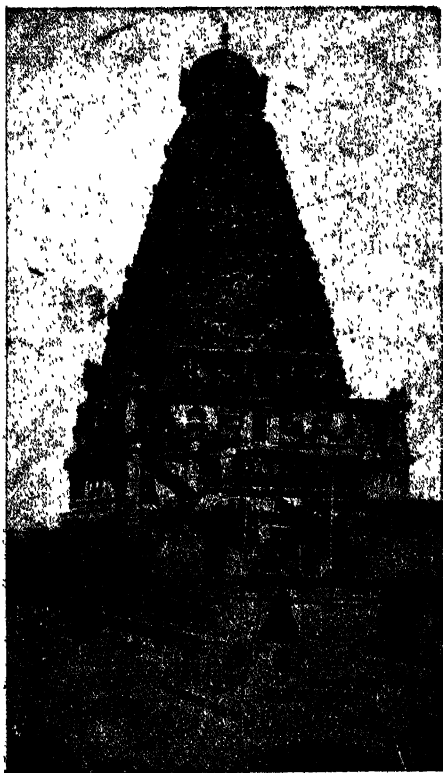
তাঞ্জোরের মন্দির

করিতে গেলেন। স্নানের পূর্ব্বে সরোবরের ধারে তিনি তাঁহার জামা খুলিয়া মাটিতে রাখিলেন। জামা খুলিবার সময় হঠাৎ

তাঁহার অগোচরে পকেট হইতে রেশমের থলিয়াটি পড়িয়া গেল। শিকারী স্নান করিতে আরম্ভ করিলেন। সে-সময় একটা বাজপাখী সোঁ করিয়া নীচে নামিয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে রেশমের থলিটিকে কোন খাদ্য মনে করিয়া, মুখে লইয়া উড়িয়া চলিল।

থলির মধ্যে অন্যান্য পয়সার সঙ্গে যে আমিও বসিয়া ছিলাম, বাজপাখী তো আর তাহা জানে না! সে নিষ্ঠুরের মত আমাকে শূন্যে উড়াইয়া লইয়া চলিল।

বহুক্ষণ পরে পাখীটি ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিতে লাগিল। দূর হইতে দেখিলাম, একটি উন্নত মন্দির অপরূপ সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল হইয়া কেমন শোভা পাইতেছে!

মন্দির দেখিলাম বটে; কিন্তু তখন কি জানিতাম যে, উহা তাঞ্জোরের বিখ্যাত মন্দির!

পাখীটি ক্রমশঃ নামিতে লাগিল—তীব্রবেগে নামিতে লাগিল। আমার দুই পাশে বাতাস সোঁ-সোঁ করিয়া বহিতে লাগিল। শীতল বাতাসের স্পর্শে ও নিম্নে—বহু নিম্নে বিশাল পৃথিবীর এমন ক্ষুদ্র মূর্ত্তি দর্শনে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল,—আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

ভয়ে ও আতঙ্কে আমি চক্ষু বন্ধ করিলাম।

তের

চক্ষু আমার তখনও বন্ধ; কিন্তু শুনিলাম, আমার কানের কাছেই কয়েকজন লোক কি বলাবলি করিতেছে!

একজন কহিল,—"মন্দিরে ঢুক্‌তেই একটা পয়সা লাভ! এখন এটাকে দিয়ে কি করা যায় বল ত?"

অপর লোকটি কহিল,—"কি আর করবে? যাচ্ছ ত মন্দিরে, সেখানে দেবতার পায়ে অঞ্জলি দিও।"

"আরে ধেৎ! এমন কালো একটা পয়সা কি দেবতাকে দেওয়া চলে? তার চেয়ে এক পয়সার বিড়ী কিনে খেলে কাজ হবে,"—বলিয়া প্রথম লোকটি আমাকে লইয়া তখনই এক বিড়ীর দোকানে উপস্থিত হইল। পরক্ষণেই আমি বিড়ীর দোকানে আশ্রয় লাভ করিলাম। কিন্তু সে কেবল দুই-এক ঘণ্টার জন্য। তার পরেই বিড়ীওয়ালার হাত হইতে আমি এক তীর্থযাত্রীর হাতে উপস্থিত হইলাম। তীর্থযাত্রীর সঙ্গে দুই-চারি দিন এখানে সেখানে ঘুরিয়া আমি আবার এক তীর্থস্থানে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু দূর হইতে মন্দিরের চেহারা দেখিয়াই বুঝিলাম, আমি আবার সেই মাদুরায় উপস্থিত হইয়াছি।

মনে একটু দুঃখ হইল—তাঞ্জোরের মন্দির ভাল করিয়া দেখিতে পারিলাম না। পাখীর মুখ হইতে মাটিতে পড়িবার

সময় কেবল কিছুক্ষণের জন্য একবার তাহার চেহারা দেখিয়াছিলাম—কিন্তু তাহার ভিতরের ঐশ্বর্য্য দেখিতে পারিলাম কই ?

যাহোক্, দেখিলাম মন্দিরের ভিতরে বাহিরে তখন অগণিত নরনারী। তাহাদের সাজসজ্জা ও কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, সকলে হিন্দু নহে।

একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম,—হিন্দুর মন্দিরে এত অহিন্দু কেন ?—কিন্তু তখনই—তীর্থযাত্রী ও দর্শকেরা পরস্পর যে আলাপ করিতেছিল, তাহাতেই ঐ প্রশ্নের জবাব পাইলাম।

শুনিলাম, ভারতের অধিকাংশ হিন্দু-মন্দিরে যে সকল কড়াক্কড়্ নিয়ম আছে,—মাত্বরার মন্দিরে তাহা নাই। এখানে অহিন্দু দর্শকও মন্দির দর্শনে বঞ্চিত হয় না এবং মন্দিরের অধিকাংশ স্থানেই তাহারা প্রবেশ করিতে পারে।

মন্দিরের নিকটে আসিতেই মনে পড়িল সেই তামিল ভাষার প্রবাদ, "জীবনে যে কখনও মাত্বরা দেখে নাই, সে পরজন্মে গাধা হইয়া জন্মগ্রহণ করে।"

ইহা মনে হইতেই একটু হাসি পাইল। আশ্বস্ত হইলাম যে, পরজন্মে নিশ্চয়ই গাধা হইতে হইবে না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার একটা আতঙ্ক হইল। ভাবিলাম, এজন্মে 'পয়সা' হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি!—তাহা না হইয়া গাধারূপে অবতীর্ণ হওয়া কি বেশী তুঃখের বিষয় ?

সমস্যার সমাধান হইল না—তখনই ঠক্ করিয়া একটা ঠোক্কা খাইলাম।

আমি যে ভক্তের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম, সে ক্রমাগত এখানে সেখানে প্রণাম করিয়া যাইতেছিল। তাহাতেই আমি একবার তাহার গামছা-বাঁধা অবস্থায় ঠক্ করিয়া মাটিতে
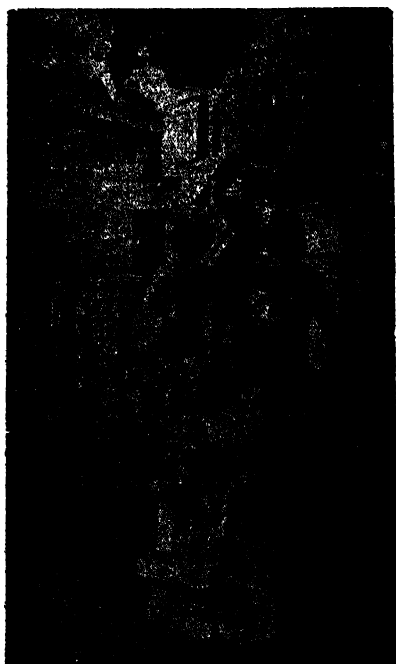
সুব্রহ্মণ্য দেবতার মূর্ত্তি

পড়িয়া গেলাম—একটা বিষম ঠোকা খাইয়া আমি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম।

আমা'র ভক্ত বাহন নানা দেবতা দর্শন করিয়া অবশেষে আসিল সুব্রহ্মণ্য দেবতার কাছে।

সুব্রহ্মণ্য দেবতার মূর্ত্তিটি পাথরে তৈয়ারী—নানা রকম কারুশিল্পে সুশোভিত !

ভক্তটি এইখানে আসিয়া থামিল এবং প্রণাম করিয়া আমাকে দেবতার পায়ে অঞ্জলি প্রদান করিল।

বোধ হয় এক ঘণ্টা ঐখানেই পড়িয়া রহিলাম। ঘটনাচক্রে এখন আবার কোথায় যাইয়া পড়ি, কে জানে?—সেখানে থাকিয়া মনে মনে নানা রকন জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলাম।

পুরুত ঠাকুর ছিলেন তামাকের ভক্ত। সম্ভবতঃ তাঁহার তামাকের পিয়াসা হইয়াছিল। কাজেই ঘণ্টাখানেক পরেই আমি এক তামাকের দোকানে আশ্রয় লাভ করিলাম !

সেখানে দুই মিনিটও বিশ্রাম করিবার সুযোগ পাইলাম না; এক সাহেব আসিয়াছিলেন একটি দুয়ানী ভাঙ্গাইতে। আমি সেই দুয়ানীর পয়সার সঙ্গে সাহেবের পকেটে স্থান পাইলাম।

সাহেবটি প্রকাণ্ড ধনী। নিজের দুই-একখানা জাহাজ আছে, বিলাতে বাড়ী-ঘর আছে। রেল-জাহাজ ও এরোপ্লেনে ঘুরিয়া বেড়ানোই তাঁহার জীবনের খেয়াল। যুদ্ধের সময় তিনি নিজের হাতে এরোপ্লেন চালাইয়াও গবর্ণমেণ্টকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন; সুতরাং যুদ্ধের উন্নতপ্রণালীর অস্ত্র-শস্ত্র ও অনেক কল-কব্জার সঙ্গে তিনি বিশেষ পরিচিত। এসম্বন্ধে ভারতে আসিয়া তিনি নানা স্থানে অনেক বক্তৃতাও দিয়াছেন।

তাঁহার কাছেই শুনিলাম, জার্ম্মেনীতে একপ্রকার যন্ত্র

আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিপক্ষের বিমানপোত আশেপাশে কোথাও থাকিলে এই যন্ত্রে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

একদিন—কি একটা কথায় জানি না, আমার বাহন সাহেবটির সঙ্গে অপর একটি সাহেবের তুমুল ঝগড়া হইল। উভয়েই উভয়কে বেশ্ করিয়া শাসাইয়া দিলেন।
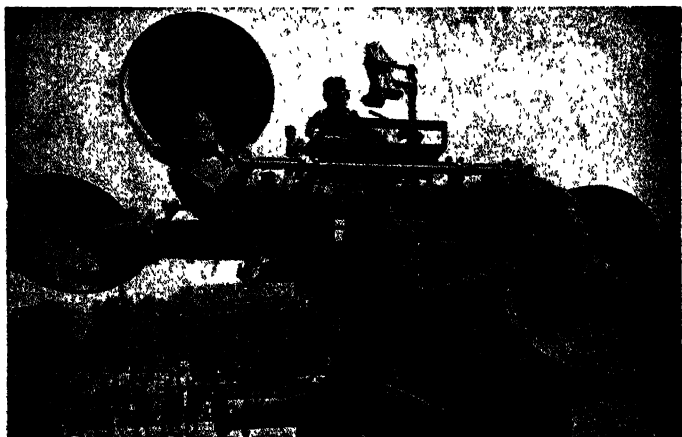
জার্ম্মেনীর আবিষ্কৃত অভিনব যন্ত্র

তারপরে আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। তাঁহার সঙ্গে রেল, জাহাজ ও এরোপ্লেনে চড়িয়া নানা দেশ-বিদেশ দেখিতে লাগিলাম।

সাহেবটির একদিন সখ হইল,—তিনি দক্ষিণ-ভারত হইতে পেশোয়ারে যাইবেন। সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইল এবং

যথাসময়ে তাঁহারা চারি-পাঁচজন সাহেব এরোপ্লেনে পেশোয়ার রওনা হইলেন।

সাহেবদের প্রত্যেকেরই একটি করিয়া প্যারাশুট্‌ ছিল। হঠাৎ এরোপ্লেন হইতে নামিবার আবশ্যক হইলে পিঠে প্যারাশুট্‌ লইয়া যে কেহ নিরাপদে নীচে লাফাইয়া পড়িতে পারে। বিমানযাত্রীদিগের পক্ষে প্যারাশুট্‌ একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস।

সাহেবটি এরোপ্লেনের এক পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছেন, এমন সময়—যে সাহেবের সঙ্গে
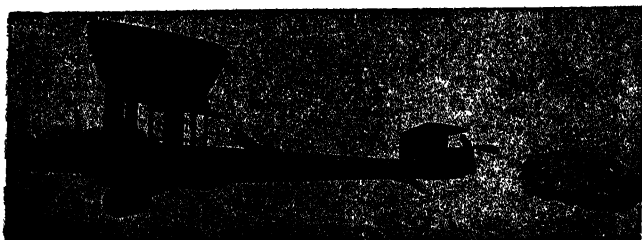
পড়িতে পড়িতেও প্যারাশুট্‌ খুলিয়া ফেলিলেন

তাঁহার একদিন বিষম ঝগড়া হইয়াছিল,—তিনি আমার বাহন সাহেবটিকে প্রচণ্ড জোরে এক ধাক্কায় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

সাহেবটি এই ব্যাপারের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না—সুতরাং একটা অস্পষ্ট চীৎকার করিয়া তিনি এরোপ্লেনের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন।

কিন্তু পড়িতে পড়িতেও তিনি প্যারাশুট্ খুলিয়া ফেলিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে প্যারাশুট্ ফুলিয়া উঠিল—সাহেব প্যারাশুটের দড়ি ধরিয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িলেন—আমার সমস্ত অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

হঠাৎ দম্-দম্ করিয়া দুইটি গুলী আমাদের পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। আমার মনে হইল, এরোপ্লেনের সব কয়জন সাহেব সম্ভবতঃ আজ এই হতভাগ্য সাহেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে!

এ কি তবে অর্থলোভ?—না আর কিছু?

চৌদ্দ

চায়ের টেবিলে পেয়ালার টুং-টাং শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখিলাম, চারিদিকে সূর্য্যের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে—সমস্তই ঝক্‌ঝকে, উজ্জ্বল।

প্রকাণ্ড তাঁবু—তাঁবুর মাঝখানে লম্বা টেবিল—তাহাতে সারি সারি পেয়ালা সাজান। টেবিলের চারিদিকে কয়েকজন সাহেব ও সম্ভ্রান্ত ভারতীয় লোক।

আমার বাহন সাহেবটি কহিলেন,—"মিষ্টার আয়ার্! পড়্‌বার বেলায় প্যারাশুট্ ছিল কাঁধে; কাজেই কোন চোট্

লাগে নি। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা ধাক্কা খেয়ে প'ড়ে যাওয়ায় প্রথমে আমার বুকটা খুবই কেঁপে উঠেছিল। তাই, একটু বিব্রত হয়েছিলুম—এখনও তাই একটু অসুস্থ বোধ করছি। তা' ছাড়া, আর কোন কষ্টই আমার হয় নি।"

আয়ার্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিন্তু আপনাকে হঠাৎ এমন ভাবে ঠেলে ফেল্‌বার কারণটা কি মিষ্টার ব্রাউন্?"

"ওঃ!—সে একটা সামান্য কারণ।" বলিয়াই আমার বাহন সাহেবটি একটু হাসিলেন। তারপর আবার কহিলেন,—"কারণটি সামান্য হলেও সে তা' বরদাস্ত কর্‌তে পারে নি, কোন কোন লোকের পক্ষে তা' বরদাস্ত করা কঠিনও বটে। কারণটা হচ্ছে এই যে, একদিন ওর সঙ্গে আমার একটু ঝগড়া হয়। আমি জান্‌তুম, সে অনেক বছর আগে এক লড়াইয়ে বিপক্ষের গুপ্তচরের কাজ করেছিল। আমি সে-কথা ব'লে ওকে ছু'-একটি কড়া কথা বলেছিলুম—ওকে 'দেশদ্রোহী', 'দেশের শত্রু' ব'লে গালি দিয়েছিলুম। তারই প্রতিশোধ নেবার সে চেষ্টা কর্‌লে। প্যারাশুট্‌টা সাথেই ছিল, তাই এ যাত্রা বেঁচে গেছি।"

মিষ্টার আয়ার্ কহিলেন,—"তা' আপনি ওর নাম জানেন তো মিষ্টার ব্রাউন্? ওর নাম-ঠিকানা দিন, আমি ওকে একটু শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কর্‌ছি।"

ব্রাউন্ কহিলেন,—"না, সে-সব আমি পছন্দ করি না। যা হবার তা' হয়ে গেছে, কিন্তু—"

হঠাৎ একটা বিপুল চীৎকারে তাঁহাদের চায়ের টেবিলের শান্ত কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। ব্যাপার কি বুঝিবার আগেই একটি মাদ্রাজী কুলী বেগে তাঁবুর মধ্যে আসিয়া কহিল,—"ভাগো, ভাগো সাহেব! হাতী—বুনো হাতী!"

তৎক্ষণাৎ একটা মহা বিপর্য্যয় হইয়া গেল—চা-পেয়ালা ফেলিয়া সকলেই প্রাণের ভয়ে বাহির হইয়া পড়িল। আমার বাহন সাহেবটি বোধ হয় বাহির হইলেন সকলের পরে। বাহির হইতেই তিনি দেখিলেন, মূর্ত্তিমান যমের মত এক উন্মত্ত হস্তী তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। নিরস্ত্র সাহেব প্রাণভয়ে আত্মহারা হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন! আতঙ্কে আমিও শিহরিয়া উঠিলাম। সহসা একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম, উন্মত্ত হস্তী তখনও আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারও পশ্চাতে আরও একপাল হাতী—তাহাদের পিঠে মাহুত; তীব্রবেগে ঐ হাতীটির অনুসরণ করিয়া আসিতেছে।

সাহেব ছুটিতেছিলেন আঁকিয়া বাঁকিয়া। বুনো হাতী অমন আঁকা-বাঁকা চলিতে অভ্যস্ত নহে, সুতরাং মোড় ফিরিতেই তাহার গতি মাঝে মাঝে কমিয়া আসিতেছিল। সেই অবসরে পেছনের হাতীগুলি তাহার অনেকটা নিকটে আসিয়া পড়িল।

হঠাৎ চলন্ত হাতীগুলি হইতে কয়েকটি দড়ির ফাঁস আসিয়া পড়িল বুনো হাতীটির সম্মুখে! তাহাদের একটিতে বুনো হাতীর পা জড়াইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎ হইতে একটা প্রচণ্ড আকর্ষণে দড়ির ফাঁসটি তাহার পায়ে ভালরূপে

আট্‌কাইয়া—তাহার গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ অন্যান্য হস্তীর সমবেত চেষ্টায় বুনো হাতীটিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা হইল।

চারিদিক আনন্দের কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল।

* • *

ইহার পরে হাতীটিকে যখন দেখিতে গেলাম, তখন তাহার বন্দী-জীবন আরম্ভ হইয়াছে—সে তখন কঠোর শাস্তি ভোগ

পোষ মানাইবার জন্য বুনো হাতীর সাজা

করিতেছিল। তাহাকে পাহাড় হইতে ধরিয়া আনিয়া খোঁয়াড়ে আটক রাখা হইয়াছিল। কিন্তু দৈবাৎ খোঁয়াড় ভাঙিয়া বাহিরে যাইয়া সে যে ভীষণ কাণ্ড করিয়াছে, আমরাও তাহার সাক্ষী।

দেখিলাম, হাতীটির চারি পায়ে, পেটে, গলায় মোটা মোটা দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে এমনভাবে রাখা হইয়াছে যে, সাধ্য কি সে আর সেখান হইতে বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করে! বুনো হাতীকে পোষ মানাইবার জন্য—তাহার হিংস্র স্বভাব দূর করিবার জন্য, ঐরূপ বাঁধিয়া রাখিবার রীতি শ্যামদেশেই বেশী প্রচলিত।

শুনিলাম, কয়েকদিনের মধ্যেই ছয়-সাতটি হাতী ধরা পড়িয়াছে। সেগুলি খোঁয়াড়েই আবদ্ধ ছিল। আমার বাহন সাহেবটি তাহা দেখিতে গেলেন। খোঁয়াড়ের মধ্যে বুনো হাতীগুলি অন্যান্য পোষা হাতীর সঙ্গে একত্র আবদ্ধ। বুনো-গুলির গলায় মোটা দড়ি বাঁধা—সেগুলি খুব শক্ত থামের সঙ্গে বাঁধিয়া টানিয়া রাখা হইয়াছে। কোন কোন বুনো হাতীর পায়েও দড়ি বাঁধা ছিল।

কিন্তু বুনো হাতীর পায়ে দড়ি বাঁধা—সে যে কি সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক কাজ, তাহা না দেখিলে কাহারও বুঝিবার উপায় নাই। মাহুত তাহার পোষা হাতীর কাঁধে থাকিয়া কোনরূপে কোমর ও পায়ে ভর রাখিয়া, বাকী সমস্তটা শরীর নীচের দিকে —বুনো হাতীর পায়ের দিকে ঝুলাইয়া দেয় এবং তাহার পায়ে দড়ির ফাঁস পরাইবার চেষ্টা করিতে থাকে। দৈবাৎ যদি সে মাটিতে গড়াইয়া পড়ে, তবেই তাহার দফা শেষ! হতভাগাকে চিরদিনের জন্য শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিদায় লইতে হয়।

সাহেবটি বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই বিপজ্জনক কাজ

বেশ্ করিয়া লক্ষ্য করিলেন—আমিও করিলাম। যতক্ষণ দেখিতেছিলাম আমার বুকের স্পন্দন যেন ক্রমশঃই দ্রুত হইতেছিল। দেখিলাম হাতীর পায়ে দড়ি বাঁধিতে একটি মাহুতই সবচেয়ে বেশী ওস্তাদ। সে একাই বাঁধিল চারি-পাঁচটি হাতী। তাহার অসাধারণ সাহসে সকলেই যার-পর-নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

সে বাহিরে আসিতেই চারিদিকে মহা আনন্দের কলরব উঠিল—সকলেই তাহার সহিত আলাপ করিতে উৎসুক! কেহ কেহ তাহাকে দুই-একটি টাকা বখ্শিস্ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। আমার বাহন সাহেবটিও তাঁহার মানিব্যাগ খুলিয়া দুইটি টাকা ও কয়েক আনা খুচরা পয়সা—যা' কিছু তাঁহার সঙ্গে ছিল—সবই উহাকে বখ্শিস্ দিলেন।

বীরকে বীরত্বের পুরস্কার বা সাহসীকে সাহসের পুরস্কার দেওয়া খুবই সঙ্গত স্বীকার করি এবং সেজন্য সাহেবকে আমি মনে প্রাণে প্রশংসা করিতেও বাধ্য। কিন্তু যে তাচ্ছিল্যের সহিত তিনি অন্যান্য পয়সার সহিত আমাকেও সেই মাহুতের হাতে সম্প্রদান করিলেন, তাহা বড়ই হৃদয়-বিদারক। অন্যের দুঃখ-কষ্ট বা মতামতকে এমনভাবে উপেক্ষা করা!—এই কি মানুষের স্বভাব?

মাহুতটি রাজপুত—উদয়পুরের অধিবাসী। সে বুনো হাতী বশ করিতে খুব দক্ষ, তাই তাহাকে সেখান হইতে আনা হইয়াছিল। সুতরাং কাজ শেষ হইতেই সে তাহার নিজের

দেশে—উদয়পুরে ফিরিয়া গেল; তাহার সহিত আমিও এবার রাজপুতনার অধিবাসী হইলাম।

রাজপুতনা ভারতীয় শৌর্য্য-বীর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলাভূমি—রাজপুতনা ভারতের বক্ষঃস্থল। মিবার রাজ্য রাজপুতনার অন্তর্গত; উদয়পুর তাহার রাজধানী। মিবারের অতীত
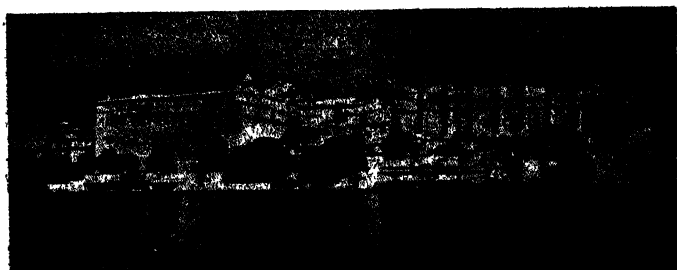
উদয়পুর-রাজপ্রাসাদ

গৌরব, অতীত কীর্ত্তি-কাহিনী, এখনও সমগ্র ভারতে প্রতিধ্বনিত হইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে ফিরিয়া যাইতেছে। মিবারের লুপ্ত গরিমা এখনও কত ঐতিহাসিক, কত কবি ও কত সাধকের প্রাণে কত স্বর্ণচ্ছবি ফুটাইয়া তুলিতেছে, কত শত অমর লেখনী তাহাতেই ধন্য হইয়া যাইতেছে! ভারতের রাজপুতনা—রাজপুতনার মিবার,—সেই মিবারের রাজধানী উদয়পুর। আমার বড় সৌভাগ্য যে আমি তেমন এক পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইলাম।

বিশাল পিচোলা হ্রদ;—তাহার পূর্ব্বপ্রান্তে মহারাণার রাজপ্রাসাদ একখানি বিচিত্র ছবির মত আকাশের গায়ে

মিশিয়া ছিল! আমি তন্ময় হইয়া সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য পান করিতে লাগিলাম। রাজপ্রাসাদের আরও কিছু নিকটবর্ত্তী হইতেই বহু লোক একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল —"ঐ—ঐ যে বলবন্ আস্‌ছে।"—একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল।

আমার বাহন—সেই মাহুতই বলবন্ সিং। সমগ্র রাজ্যে সে তাহার দুর্দ্ধর্ষ সাহসের জন্য বিখ্যাত। সুতরাং সে আসিতেই সকলে মহা আনন্দিত হইল, বিশেষতঃ তাহার মত সাহসী লোকের তখন দরকারও ছিল খুব বেশী। কারণ তখন কোথা হইতে এক সাহেব আসিয়াছিলেন; তিনি নদীর তল ও সাগরতলের ফটোগ্রাফ তুলিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি সেই পিচোলা হ্রদের তলদেশের ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্য তখন জলে নামিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। সেই ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য সকলে বলবন্‌কে ডাকিয়া লইল।

ছোট্ট একখানি মোটর-বোট্। সমস্ত দলবল সাজসরঞ্জাম লইয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল। ডুবুরী সাহেবটি তাঁহার অপরূপ পোষাকে সজ্জিত হইলেন। শুনিলাম, কেবল তাঁহার মাথার টুপিটার ওজনই—ত্রিশ সেরের উপর!

বলবন্ জিজ্ঞাসা করিল,—"অত ভারী টুপি তাঁর মাথায় থাক্‌বে কতক্ষণ?"

হাসিয়া অপর একটি সাহেব কহিলেন,—"জলে নাম্‌লেই যে সমস্ত জিনিসের ওজন খুব হাল্‌কা হয়ে যায়! জলের

তলায় গেলেই এই ভারী টুপিটা ঠিক পাখীর পালকের মত হাল্‌কা বোধ হবে।”

বলবন্ অতি আগ্রহের সহিত সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহার জামার বুক-পকেটে থাকিয়া আমিও খুব আগ্রহের সহিত সব দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সাহেব একটি ঝুলানো তার ধরিয়া জলে নামিতেছেন, অপর একটি সাহেব টুপিটিকে ধরিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে ডুবুরী সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও নীচের দিকে নামাইয়া দিতেছিলেন। সকলেরই মুখে কৌতুক ও বিস্ময়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন, বুকে অফুরন্ত আনন্দ ও অসীম আগ্রহ। বলবন্ মোটর-বোটের একপাশে ঝুঁকিয়া দেখিতেছিল, তাহাতে আমারও দেখিবার বেশ্ সুবিধা হইল।

সাহেবের নামিতে কতক্ষণ লাগে, তাহা অনুমান করিবার জন্য আমি ঘড়ীর সেকেণ্ডের কাঁটার মত নিজ মনে গণিতেছিলাম—এক, দুই, তিন, চার,—

ব্যস্! হঠাৎ কতকগুলি টাকা-পয়সা আমার গায়ে হুম্ড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। আমি অমনি যথাসাধ্য চীৎকার করিয়া বলিলাম,—“এ কি?”

—কিছুই বুঝিলাম না। একরাশি জল আমার চারিদিকে লাফাইয়া উঠিল।

ভাল করিয়া তাকাইতে পারিলাম না,—তরল জলরাশির একটা ঘোলাটে পরদা নাচিয়া নাচিয়া আমার চক্ষুর ভিতর

পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিল—একটা তীব্র শীতল কোমল-কঠোর স্পর্শে কে আমাকে কোন্ অতলে ঠেলিয়া দিল কে জানে?

জলের তলদেশ পর্য্যবেক্ষণের জলে নামিতেছে

ক্রমাগত শীতল তরল স্রোতে ঘুরপাক খাইতে খাইতে আমি যখন তলদেশে পৌছিলাম, তখনও আমি সংজ্ঞা হারাই নাই—সব-কিছু আমার মনে ছিল।

আমরা—টাকা-পয়সা সব-গুলি, সেখানে হুড়মুড়্ করিয়া পড়িতেই অতি দুর্গন্ধময় এক-তাল কাদা আমাদের চারিদিকে লাফাইয়া উঠিল।

অতি জঘন্য কাদার স্পর্শে বিরক্ত হইয়া আমি নড়িবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু হায়! কোথায় আমার সেই শক্তি? তবে?—

তবে কে আমায় উদ্ধার করিবে?—আমি কোথায় আসিলাম—এ কোন্ দেশ?

পনের

একতাল কাদার উপর শুইয়া নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছি—হঠাৎ বন্-বন্ করিয়া এক ঝাঁক মাছ আমার মাথার উপর দিয়া খেলিয়া গেল।

অমন ছোট্ট ঝক্‌ঝকে মাছগুলি দেখিয়া আনন্দ হইল খুব। ইচ্ছা হইল, একবার ডাকিয়া বলি,—"এসো আমার সাথে খেলা কর্‌বে।" কিন্তু আমার ভাষা—মুখে যা' কোনদিনই ফুটে নাই,—কেমন করিয়া তা' আমি উহাদিগকে বুঝাইব ?

বিশেষতঃ উহারা আছে আনন্দে। উহারা নিজের দেশে স্বাধীনভাবে মুক্ত আবহাওয়ায় খেলিয়া বেড়ায় ! আর আমি ? —যাক্, সে কথা না বলাই ভাল। বুকের বেদনা মুখে ফুটাইবার উপায় নাই,—স্বাধীন মুক্ত প্রাণীর মত চলিয়া বেড়াইবার উপায় নাই,—ক্রমাগত লক্ষ অবস্থায়, লক্ষ মানুষের হাতে আমি পুতুলের মত নাচিয়া বেড়াইতেছি ! এই তো আমার জীবন !—তবু আমার সেই শত দৈন্য, শত দুঃখের মধ্যেও ঐ নিরীহ মাছগুলিকে দেখিয়া আনন্দ হইল কত ! মনে হইল, মানুষের হাতে খেলার জিনিস না হইয়া ঐ নিরীহ মাছগুলির সংস্পর্শে থাকা কত সুখের ও কত লোভনীয় ! কি সুন্দর, কি মনোরম ঐ—

এ কি !—আর ভাবিতে পারি নাই। হঠাৎ দেখি প্রকাণ্ড

একটা মাছ তাহার বিশাল মুখ খুলিয়া, আমরা যে কয়টি টাকা-পয়সা সেখানে পড়িয়া ছিলাম, আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিল। ভয়ে শিহরিয়া আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। কিন্তু—হঠাৎ মাছগুলি অমন ভাবে ছুটিয়া পলাইল কেন? কে আমার কাতর ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া আমাকে রক্ষা করিতে আসিল?

আশে পাশে ও আমার মাথার উপরে, সমস্ত জলগুলি নড়িয়া উঠিল—প্রবলভাবে কাঁপিয়া উঠিল,-কে একজন ধপ্ করিয়া আমারই কাছে, খুব কাছে—উপর হইতে নামিয়া আসিল। প্রথমে চিনিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তারপরেই চিনিলাম,-এ যে সেই ডুবুরী সাহেব, বলবনের পকেটে থাকিয়া আমি যাঁহাকে মোটর-বোটে দেখিয়াছিলাম!

সাহেব সেই জলের তলায় নামিয়া, একবার চারিদিকে বিশেষভাবে কিসের অনুসন্ধান করিলেন। তারপর তাঁহার পায়ের কাছে আমাদিগকে দেখিয়া, একটু হাসিলেন এবং আমাদিগকে মাটি হইতে তুলিয়া তাঁহার পকেটে পুরিলেন। মনে হইল, তিনি যেন আমাদেরই অনুসন্ধান করিতেছিলেন!

ভাবিলাম, তাহা অসম্ভব নহে। বলবনের পকেট হইতে অন্যান্য টাকা-পয়সার সঙ্গে আমি যখন জলে পড়িয়া যাই, সাহেব নিশ্চয়ই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সুতরাং জলে নামিয়া তিনি সকলের আগে কিছু অর্থলাভ করিয়া লইলেন।

সাহেব ছোট্ট একখানি টেবিলের উপর একটি ক্যামেরা

সাজাইলেন। টেবিল ও ক্যামেরা নিশ্চয়ই তিনি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তারপর, জলের তলায় মাছ ও নানা রকম লতাপাতার ফটো তুলিতে লাগিলেন।

সাহেব উপরে আসিতেই চারিদিকে একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। গভীর জলের নীচে মানুষ যাইয়া আবার
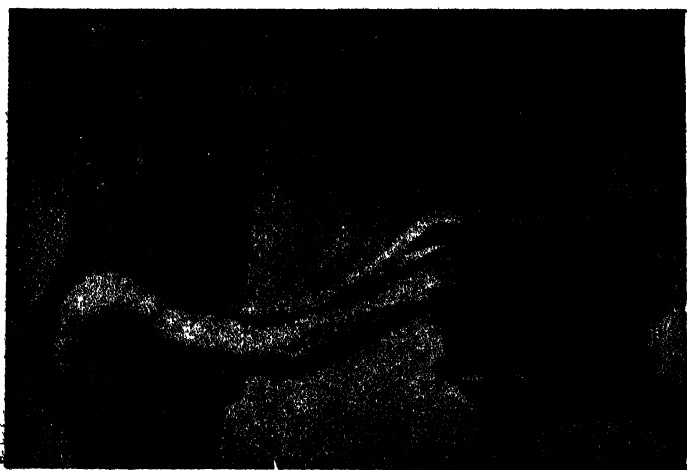
জলের নীচে ফটো তোলা হইতেছে

সেখান হইতে জ্যান্ত ফিরিয়া আসে—ভারতবর্ষে এমন ধরণের দৃষ্টান্ত যে অতি বিরল!

পরস্পর জানিতে পারিলাম, সাহেব নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তি নহেন। প্রবালের খোঁজে তিনি বহুবার সমুদ্রের নীচেও অবতরণ করিয়াছেন।

প্রবাল অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, সাগরতল ইহাদের জন্মস্থান। ক্ষুদ্র হইলেও প্রবালের শক্তি নিতান্ত নগণ্য নহে। কোটি কোটি প্রবাল-কীট সাগরতলে জন্মগ্রহণ করে, কালক্রমে
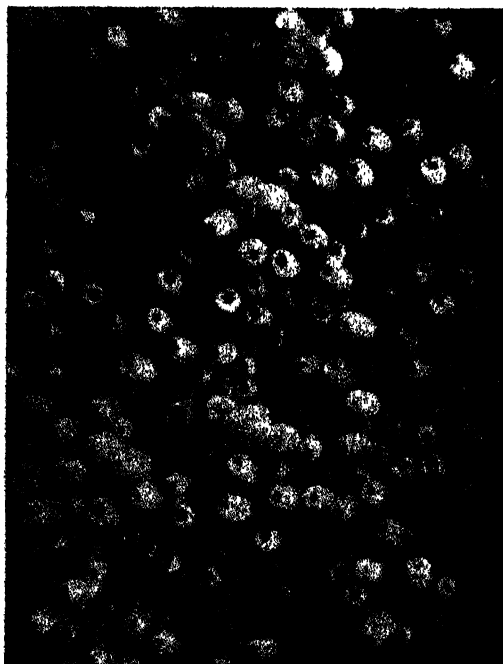
মৃত প্রবাল-কীটের দেহপুঞ্জ

তাহারা সেইখানেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তারপর তাহাদের সেই মৃতদেহের উপর আবার একদল প্রবাল-কীট জন্মিয়া বসবাস করিতে থাকে। কিন্তু তাহারাও মরিয়া আবার এক স্তর মৃত

প্রবাল-কীটের চিহ্ন সেখানে রাখিয়া যায়। এইরূপে ক্রমাগত স্তরের উপর স্তর, তাহার উপর আবার এক স্তর জমিতে জমিতে অতল মহাসমুদ্রে কত যে দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ?

ডুবুরী সাহেবটি অনেকবার সমুদ্রে নামিয়া প্রবাল-দ্বীপের ও প্রবাল-কীটের কত ছবি তুলিয়া আনিয়াছেন তাহার কোন সীমা-সংখ্যা নাই ! একটি ছবি আমার খুবই ভাল লাগিল। মৃত প্রবাল-কীটগুলির ফটো বড় করিয়া তুলিলে তাহা যে কত সুন্দর দেখায় ইহা তাহারই ছবি।

ছবিতে দেখিলাম, মৃত প্রবাল-কীটগুলি কত অপূর্ব্ব রহস্যময় ! তাহাদের বাহিরের খোলস, যেটুকু শক্ত, তাহাই পড়িয়া আছে। ভিতরে কীটের মূল দেহ—পেট, মুখ ইত্যাদি সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রবাল-কীটের কাহিনী শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সেই সঙ্গে সাহেবটির উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা আমার শতগুণ বাড়িয়া গেল।

উদয়পুর-রাজপ্রাসাদে সাহেবের কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কাটিল। তারপর তিনি আবার একদিন পূর্ব্বের মতই দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিল বলবন্।

বিভিন্ন গ্রাম-নগর বেড়াইয়া আমরা যেইদিন সীমান্ত-পথে 'থাইবার' গিরি-সঙ্কটে (Khyber Pass) উপস্থিত হইলাম, সে-দিন আমাদের এক স্মরণীয় দিন।

আমরা এক বিশাল দলের সহযাত্রী হইলাম। পার্ব্বত্য

পথে—দক্ষিণে বামে, উভয়দিকে পর্ব্বতশ্রেণীর কর্কশ সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিন্তু সাহেব পথশ্রমে কাতর হইয়া ক্রমাগতই পেছনে পড়িতে লাগিলেন। অবশেষে সাহেবের দেহে কিছু জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, তিনি নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন।

'খাইবার' গিরি-সঙ্কটে

আমাদের সহযাত্রীরা সকলেই চলিয়া গেল, কেবল সাহেব ও তাঁহার সঙ্গী বলবন্ সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্য-পথে সঙ্গিহারা অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

বলবন্ কহিল,—"সাহেব! এখন উপায়?"

সাহেব কহিলেন,—"তুমি ফিরে যাও বলবন্! একটু সুস্থ না হলে আমার পক্ষে চলা অসাধ্য।"

বলবন্ কহিল,—"আমি আমার নিজের জন্য ব্যস্ত হচ্ছি না সাহেব! আমি আপনাকে ফেলে কোথাও যাব না, তা' ঠিক্। কিন্তু আমাদের এখন রক্ষার উপায় কি সাহেব? সন্ধ্যা হয়ে আস্ছে, এসব জায়গা তো চোর-ডাকাতের লীলাভূমি।"

"সবই জানি বলবন্। কিন্তু আজ রাতটা যে আমার নড়্বার কোন উপায়ই নেই, বলবন্!"—সাহেবের চোখে মুখে অসহায় দুর্ব্বল অবস্থার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

তিনি কহিলেন,—"বলবন্! থাক্বার মাঝে কেবল আছে এই একটি পিস্তল"—বলিয়াই তিনি তাঁহার প্যাণ্টের পকেট হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া বলবন্‌কে দেখাইলেন।

হঠাৎ "গুম্ গুম্" করিয়া দুইবার ভীষণ শব্দ হইল। সাহেবের প্রসারিত হস্ত আর তিনি গুটাইতে সমর্থ হইলেন না। একটা কাতর চীৎকারে মুহূর্ত্তের জন্য সেই গিরিসঙ্কট প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; পরক্ষণেই তাঁহার অসাড় দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল—এক ঝলক টাট্‌কা রক্তে বলবনের সারা দেহ রঞ্জিত হইয়া গেল।

সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইল এক নিমেষে। আমি কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ বলবন্‌ও কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সমস্ত বুঝিবার পূর্ব্বেই তীব্রবেগে চারিজন অশ্বারোহী সেখানে ছুটিয়া আসিল। বলবন্ মুহূর্ত্তের মধ্যে সাহেবের পিস্তলটি কুড়াইয়া লইয়া সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারে কোথায় সরিয়া পড়িল।

হতভাগ্য সাহেবের রক্তাক্ত দেহ সেখানেই পড়িয়া রহিল। সাহেবের বুকের রক্তে আমারও সর্ব্বশরীর ভিজিয়া গেল—একটা গভীর আতঙ্কে আমি দিশাহারা হইলাম।

ষোল

তারপর ?—

তারপর—টর্চ্চের তীব্র আলোকে রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া যে পৈশাচিক কার্য্য সম্পন্ন হইল, জগতে তাহার তুলনা বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

সেই পাহাড়ী দেশের অসভ্য ডাকাতগুলি সাহেবের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল,—তাঁহার টাকা-পয়সা, আংটি-ঘড়ী কিছুই বাদ পড়িল না—সমস্তই হস্তগত করিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাহাদের হাতে পড়িলাম।

ডাকাতগুলি কেবল তাহাতেই ক্ষান্ত রহিল না। তাহাদের একজন কহিল,—"হতভাগার নাক-মুখ উড়িয়ে দে ; তা' নৈলে কালই পুলিশ ফৌজ বেরিয়ে, একে সনাক্ত করিয়ে নেবে, আর খুব ধর-পাকড় সুরু হবে।"

দ্বিতীয় ডাকাত কহিল,—"হাঁ, ঠিক্ বলেছিস্ ভাই ! কেউ যাতে একে চিন্‌তে না পারে, তার বন্দোবস্ত ক'রে ফেল।

শিকার করলি বটে, কিন্তু একটা সাহেব শিকার! সাহেব না হয়ে যদি একটা ভারতবাসী হ'ত তা' হলে এত ভাব্‌বার কিছু ছিল না। কিন্তু একটা সাহেব খুন হয়েছে, একথা যখন প্রকাশ হবে, তখন সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্য সারা সীমান্ত-প্রদেশটা চ'ষে ফেল্‌বে।"

কথাটা সকলেরই খুব যুক্তিযুক্ত বোধ হইল, সকলেই তাহাতে "হাঁ হাঁ, ঠিক্ বলেছিস্" বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

তারপরে সকলে মিলিয়া যে কাজ আরম্ভ করিল, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা কঠিন। সাহেবের সমগ্র দেহটি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হইল, তাহার নাক-মুখ, চোখ-কান, হাত-পা —সমস্তই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হইল,—সাধ্য কি যে, আর কেহ সেই সব দেখিয়া সাহেবকে সনাক্ত করিতে পারে!

ডাকাতগুলির বীভৎস কাণ্ডে আমার সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল, একটা তীব্র ঘৃণা ও মর্ম্মান্তিক বেদনায় আমার সমগ্র প্রাণটা ভরপুর হইয়া গেল। সেই অন্ধকার রাত্রিতে তেমন পৈশাচিক কাণ্ড দেখিয়া স্বয়ং শয়তানও বুঝি ভীত হইয়া পড়িল।

তারপর সাহেবের দেহের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংশগুলি ইতস্ততঃ চারিদিকে ছড়াইয়া সেই নৃশংস বিজয়ী ডাকাতের দল তাহাদের আড্ডার উদ্দেশে রওয়ানা হইল। 'খাইবার পাসে'র দুঃসহ স্মৃতি আমাকে কেবলই বৃশ্চিকের মত দংশন করিতে লাগিল।

পার্ব্বত্য অঞ্চলে ছোট একখানি বাড়ী—তাহাই সেই ডাকাতদিগের আড্ডা।

অসভ্য আফ্রিদি জাতি জীবিকা নির্ব্বাহের আর কোন উপায় না পাইয়া ডাকাতি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। সে-দেশের জমি ও জলবায়ু—কিছুই কৃষিকার্য্যের উপযোগী নহে। প্রাকৃতিক কঠোরতা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনেও

খাইবার পাস্—আফ্রিদি-শিবির

একটা কঠোরতার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। দয়া-মায়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি সম্ভবতঃ তাহাদের অন্তঃকরণে আদৌ বসিতে পারে না। তাই তাহারা প্রকৃতির কোলে ইতস্ততঃ ছড়ানো পাহাড়-পর্ব্বত-উপত্যকার দুর্গম ও বন্ধুর স্বভাবের সুযোগ লইয়া মাঝে মাঝে যাত্রীদিগের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে

ও তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়। ইহাদের অত্যাচারে সীমান্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্টকে যে কত বেগ পাইতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

সেই আড্ডার অধিকারী আট-দশটি ডাকাত। রক্তপাত তাহাদের দৈনিক ব্রত, নিষ্ঠুরতা তাহাদের সাধনা। প্রত্যহ গভীর রাত্রিতে তাহাদের লুটের মাল 'বখরা' হইয়া থাকে। সাহেবের কাছে যাহা কিছু পাওয় গিয়াছিল, তাহাও যথারীতি সকলের মধ্যে ভাগ করা হইল—আমি নেড়া-মাথা মোটা দাড়ীওয়ালা এক ডাকাতের ভাগে পড়িলাম। সাহেবের একটি লাল রেশমী রুমালও এই ডাকাতের সম্পত্তি হইল।

ভোর হইল। ডাকাতগুলি যে যাহার কাজে বাহির হইয়া—দৈনন্দিন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। আমি যাহাকে আশ্রয় করিয়াছিলাম, সে পাগ্‌ড়ীতে লাল রেশমী রুমাল জড়াইয়া বন্দুক হাতে আনাচে কানাচে ঘুরিতে লাগিল। কোথাও কোন অসতর্ক পথিক দেখিলেই সে তাহার দফা শেষ করিবে, এই হইল উদ্দেশ্য।

সারাদিন নানা জায়গায় ঘুরিয়াও কোন শিকার মিলিল না—উদ্দেশ্য সফল হইল না। সর্দ্দার যেন একটু হতাশ হইয়া পড়িল। হঠাৎ দূরে দেখা গেল, একজন শিখ একটি উটে চড়িয়া আসিতেছে। সঙ্গে তাহার বিপুল মাল-পত্র।

সর্দ্দারের বুকটা নাচিয়া উঠিল। আমি আবার একটা রক্তপাত দেখিব, এই আশঙ্কায় বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে

লাগিলাম। সর্দ্দার সেই রাস্তারই পাশে এক পাহাড়ের উপর সুবিধামত স্থান খুঁজিতে লাগিল।

আমাদের মাথার উপরে সহসা কিসের শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিলাম, একটি এরোপ্লেন ঠিক্ আমাদের মাথার উপরেই চক্রাকারে ঘুরিতেছে।
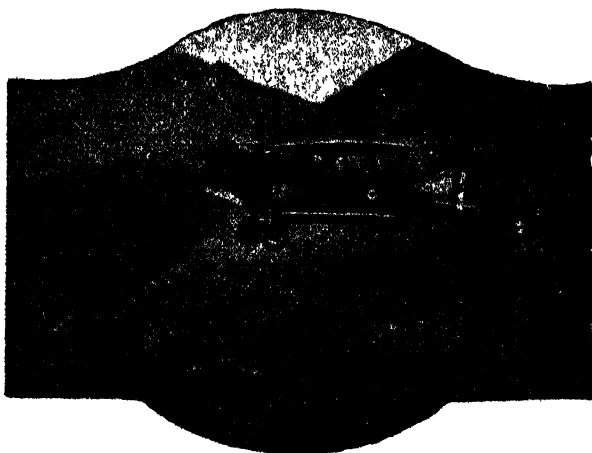
খাইবার পাস্ মাথার উপরে এরোপ্লেন

দুর্দ্দান্ত অধিবাসি-পরিপূর্ণ সীমান্ত-প্রদেশে এরোপ্লেনের এমন অভিযান একেবারেই নূতন নহে। সুতরাং আফ্রিদি-দস্যু তাহাতে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইল না কিংবা ভীতও হইল না। সে পুনরায় একমনে নিজের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

কিন্তু হঠাৎ বিপুল ঘর্ঘর শব্দ করিতে করিতে এরোপ্লেনটি মুহূর্ত্তের মধ্যে মাটিতে নামিয়া পড়িল,—সঙ্গে সঙ্গে তিনজন

লোক তাহা হইতে বিদ্যুৎগতিতে নামিয়াই আফ্রিদিকে পিস্তল লক্ষ্য করিয়া হাঁকিল,—"খবর্দ্দার!"

আফ্রিদি-সর্দ্দার তাহার বন্দুক স্পর্শ করিতেই একজন ছুটিয়া আসিয়া তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিল, এবং চীৎকার করিয়া কহিল,—"এই এক দুষ্‌মন্! এই সেই সাহেবের রুমাল," বলিয়াই এক প্রচণ্ড চড়ে রুমালশুদ্ধ তাহার পাগ্‌ড়ী খুলিয়া ফেলিল।

সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইল এক নিমেষে। কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত সময়েই আমি তাহাকে চিনিয়া ফেলিলাম, লোকটি আর কেহই নহে,—বলবন্!

বলবন্! বলবন্‌কে দেখিয়াই আনন্দে আমার বুকটা নাচিয়া উঠিল। আফ্রিদি-দস্যুর গ্রেপ্তারে আমার আনন্দ হইল তাহার চেয়েও বেশী।

আমি বুঝিলাম যে, ডাকাতের দল যত সাবধানতাই অবলম্বন করুক না কেন, সীমান্ত পুলিশ বলবনের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া ডাকাতের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল। সনাক্ত করিবার জন্য বলবন্ তাহাদের সঙ্গে ছিল। সাহেবের সেই লাল রুমালখানি তাহাদিগকে অনেকটা সাহায্য করিয়াছে। ডাকাতদিগের একজন ধরা পড়ায় অপর ডাকাতগুলিকে গ্রেপ্তার করাও সহজসাধ্য হইল। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের উপযুক্ত শাস্তি হইবে, এই আশায় আমি অনেকটা শান্তি বোধ করিলাম।

সেই আফ্রিদি-ডাকাতের হাত হইতে মুক্ত হইয়া আমি

এখন এক পদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীর আশ্রয়ে আছি। তাঁহাদের পরস্পরের কথাবার্ত্তা হইতে আমি 'খাইবার পাস্' সম্পর্কে অনেক-কিছু জানিতে পারিলাম।

কাবুল হইতে পেশোয়ার হইয়া ভারতবর্ষে আসিবার ইহাই প্রধান রাস্তা। পেশোয়ারের প্রায় দশমাইল দূরবর্ত্তী 'জামরুদ্' নামক স্থান হইতে 'খাইবার পাস্' আরম্ভ হইয়াছে। তারপর পাহাড়ের মধ্য দিয়া আঁকা-বাঁকা ভাবে প্রায় ত্রিশ মাইল লম্বা পথে ইহা কাবুল নদীর উপরে 'ডাক্কা' অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চিম সীমান্তে জালালাবাদ। ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে 'খাইবার পাস্' নিতান্ত নগণ্য নহে। কোন্ প্রাচীন কাল হইতে ইহা ভারতে আসিবার প্রধান রাস্তারূপে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার সঠিক্ ইতিহাস অজ্ঞাত।

এই পথেই মহাবীর আলেক্‌জান্দার আসিয়াছিলেন; তাহারও দীর্ঘকাল পরে আসিয়াছিলেন মাহ্‌মুদ্। তারপর তিনি পেশোয়ারের সমতলভূমিতে অবতরণ করিয়া ১০০০ খৃষ্টাব্দে জয়পালের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তারপর আসিয়াছিলেন দিগ্‌বিজয়ী বীর চেঙ্গিস্ খাঁ। তাঁহার বংশধর সম্রাট্ বাবর ও হুমায়ুন একাধিকবার এই পথেই যাতায়াত করিয়াছেন। এই পথেই নাদির শা ভারতে প্রবেশ করিয়া জামরুদের নিকটবর্ত্তী স্থানে নাজির খাঁকে পরাজিত করেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে—প্রথম আফগান যুদ্ধের সময়ে ইংরেজ ইহার সংস্পর্শে আসেন। তারপর স্থানীয় পার্ব্বত্যজাতিগুলির

সহিত ইংরেজের বহুবার সজ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও সেখানে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বজায় রাখা অনেকাংশে কঠিন।

কিন্তু বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী ও রেলওয়ের বন্দোবস্ত— 'খাইবার পাস্' ও সীমান্ত-প্রদেশকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিরুপদ্রব করিয়া তুলিয়াছে।

ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের সীমান্ত প্রদেশে—'খাইবার পাস্'। এই পথে কাহাকেও যাইতে হইলে পূর্ব্ব হইতেই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 'অনুমতি-পত্র' লইতে হয়। নতুবা কাহাকেও সেখানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। মাঝে মাঝে দুই-একটি মেম সাহেব ব্যতীত 'খাইবার পাস্' দর্শনে অভিলাষিণী ভারতীয় নারীর সংখ্যা প্রায় কিছুই নহে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পথ-কষ্ট ও বিপদের আশঙ্কাই তাহার প্রধান কারণ।

ভারতীয় নারীকে এখনও অতি সহজেই 'অবলা' বলা যায়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য নারীদিগকে এখন আর 'অবলা' বলা চলে না। বহু দুঃসাহসিক কার্য্যেও তাঁহারা এখন অগ্রসর হইয়াছেন। শুনিলাম, দক্ষিণ আমেরিকায় বন-জঙ্গল-পরিপূর্ণ ব্রেজিল প্রদেশে প্রবেশ করিতেও এখন পাশ্চাত্ত্য নারী অগ্রসর হইয়াছেন!

আমার আশ্রয়দাতা পুলিশ কর্ম্মচারীটির নিকটেই একটি ফটোগ্রাফ দেখিলাম, একটি মেম ব্রেজিল প্রদেশের একটি

ছোট নদী হাঁটিয়া পার হইতেছেন। কয়েকটি অসভ্য ব্রেজিল-বাসী তাঁহার পথ-প্রদর্শক ও দেহরক্ষীর কাজ করিতেছে।

আফ্রিদি-সর্দ্দারের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুলিশ

একটি মেম হাঁটিয়া নদী পার হইতেছেন

সাহেবের নিকট কয়েকদিন বেশ্ আনন্দেই কাটিয়া গেল। কখনও উটের পিঠে, কখনও ঘোড়ার পিঠে, কখনও মোটর-গাড়ীতে, কখনও বা এরোপ্লেনে—আমার দিন যাইতে লাগিল।

একদিন প্রভাতে সাহেব তাঁহার চায়ের টেবিলে চা-পানে ব্যস্ত, এমন সময় হঠাৎ একটু কলরব শুনিয়া সাহেব বাহিরে আসিলেন। আমিও সাহেবের পকেটে, সুতরাং ব্যাপারখানা দেখিতে আমার একমুহূর্ত্তও দেরী হইল না।

কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সমগ্র বুকখানা ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেখিলাম, কয়েকজন লোক ধরাধরি করিয়া বলবন্‌কে লইয়া আসিয়াছে। বলবনের সর্ব্বশরীর রক্তমাখা, তাহার মাথার আধখানা কে কোপাইয়া দুই ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে!

পুলিশ-সাহেবটি তাহাকে দেখিয়াই "বলবন্! বলবন্!" বলিয়া কাতর চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিন্তু কে তখন তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিবে! বলবনের দেহে তখন আর প্রাণের চিহ্নমাত্র ছিল না।

সৎকারের পূর্ব্বে বলবনের দেহ ও জামা-কাপড় অনুসন্ধান করিয়া একখানা লাল কাগজ পাওয়া গেল। তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—

"প্রতিশোধ! আফ্রিদি-সর্দ্দার গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ!"

সতের

বলবনের নৃশংস হত্যায় পুলিশ-সাহেব অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত-ভার তিনি নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন—"বলবনের হত্যাকাণ্ডের কূল-কিনারা আমি করবই করব।"

মনে একটা আশা হইল—অনেকটা স্বস্তি বোধ করিলাম; ভাবিলাম, 'এত বড় একজন সাহেব, তাঁর প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না।'

কিন্তু যতই দিনের পর দিন—মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই আমি হতাশ হইতে লাগিলাম। তথাপি সাহেবের কোন বিরাম ছিল না। তিনি এখানে-সেখানে নানা জায়গায় আসামীর খোঁজ করিতে লাগিলেন। একদিন অপরাধীর কি একটু সূত্র পাইয়া তিনি দিল্লী যাত্রা করিলেন।

দিল্লীকে সাধারণতঃ অনেকেই একটিমাত্র সহর বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দিল্লী একটিমাত্র সহর নহে; কুতুব, সিরি, তোগ্‌লকাবাদ, জাহানাবাদ, ফিরোজাবাদ, শাহজাহানাবাদ, পুরাণ কিল্লা ও নয়া দিল্লী,—এই আটটি বিভিন্ন সহর লইয়া সমগ্র দিল্লী সহর গঠিত। দিল্লীর আধুনিক বিস্তৃতি—'নয়া দিল্লী'। সুতরাং অনেকে এই 'নয়া দিল্লীকে' হিসাবে গণ্য না করিয়া সমগ্র দিল্লীতে সাতটি নগরের একত্র

সমাবেশ বলিয়া অভিহিত করেন (The Seven Cities of Delhi)।

দিল্লীতে আসিয়াই অনুভব করিলাম, আমার বুকের মাঝে কোথায় যেন কিসের একটু আঘাত লাগিল!—কিসের এই আঘাত? কিসের এই বেদনা?—অনেকক্ষণ কিছুই স্থির
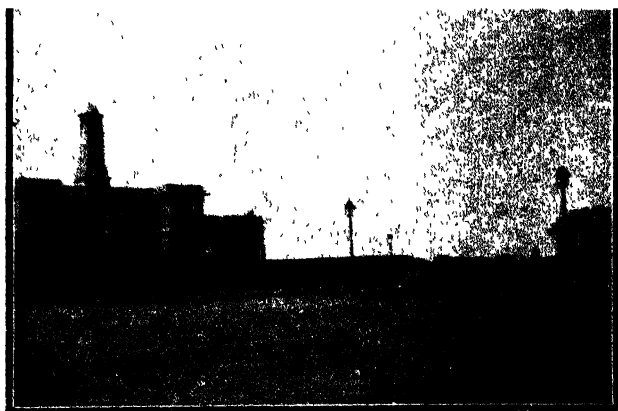
সেক্রেটারিয়েট—নয়া দিল্লী

করিতে পারি নাই। তারপর বহুক্ষণের চেষ্টায় কোন্ এক অতীত স্মৃতি আমার বুকের পর্দা ঠেলিয়া উঁকি দিতে লাগিল!

আমার মনে হইল দিল্লীর পথঘাট সবই যেন আমার পরিচিত! ইহার প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর সঙ্গে আমি যেন বিশেষভাবে জড়িত!

ধীরে ধীরে একটা অস্পষ্ট ছবি আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া

উঠিল। আমার মনে হইল সেই দীর্ঘদিবস পূর্ব্বের কথা,—সেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ—সিপাহী-বিদ্রোহের কথা।

চক্ষুর সম্মুখে জ্বলন্ত দেখিতে পাইলাম সেই রক্তনদী, আর লেলিহান অগ্নিশিখা! সেই তেওয়ারী সিপাহী ও অন্যান্য সিপাহীর দল, সেই বিপন্ন ইংরেজ রমণী ও বালক-বালিকার কাতর আর্ত্তনাদ—সমস্তই আমি প্রত্যক্ষ করিলাম!—সিপাহী-বিদ্রোহ পূর্ণরূপে আমার চক্ষুর সম্মুখে প্রকটিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু সেই সিপাহী-বিদ্রোহের দিল্লী আর বর্ত্তমান দিল্লী,—দুইয়ের মধ্যে রাত-দিন পার্থক্য যতই থাকুক্ না কেন, তবু চিনিতে পারিলাম এই সেই দিল্লী, যেখানে আমাকে লইয়া কত ছিনিমিনি খেলাই না হইয়াছে!

সেই লুট-তরাজের দিনে, ক্ষুদ্র পয়সা আমি,—আমারও রক্ষা ছিল না। এ-হাত ও-হাত, নানা হাত ঘুরিয়া আমি সিপাহী-বিদ্রোহের বিভীষিকা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, আজ দীর্ঘকাল পরে দিল্লীতে আসিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, দিল্লীর বুকে কত পরিবর্ত্তনের স্রোতই না বহিয়া গিয়াছে!

পরিবর্ত্তন যতই হউক্ না কেন, কিছুই যে আগের মত নাই, সে কথাও বলা চলে না। আমার প্রথমেই লক্ষ্য পড়িল সেই 'কুতুব মিনার'।

'কুতুব মিনার' দিল্লীর অন্তর্গত 'কুতুব' সহরে অবস্থিত। শুনা যায়, পৃথ্বীরাজের মহিষী যাহাতে দুর্গ হইতেই সহজে যমুনা নদী দেখিতে পান, সেইজন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা অমূলক—'কুতুব মিনার' বিজয়ের নিদর্শন মাত্র।

সেই সিপাহী-বিদ্রোহের সময়েও কুতুব মিনার দেখিয়াছি, আজও দেখিলাম। সমগ্র দিল্লীতে—সমগ্র ভারতে কত
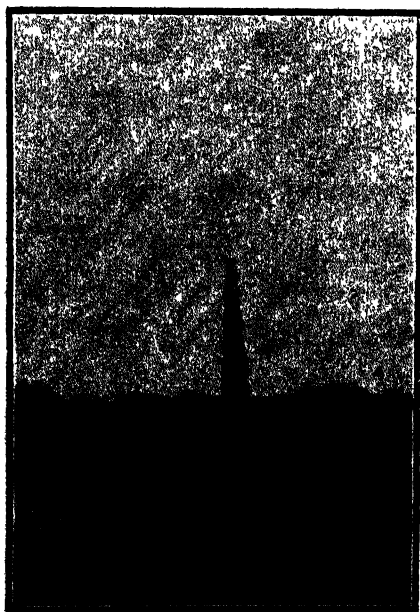
কুতুব মিনার

পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু উন্নত মিনার আজও তেমনই সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বলবনের হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানে সাহেব বিপুল পরিশ্রম

করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার গুপ্তচরদিগের একজনকে পাঠাইলেন তোগ্‌লকাবাদ কেল্লার দিকে।

গিয়াসুদ্দিন তোগ্‌লক্ তাঁহার শাসনকালে এই স্থানে প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখনও দুর্গপ্রাকার সেই অতীত স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে:

সাহেবের অন্যান্য গুপ্তচর,—কেহ সিরি, কেহ জাহানাবাদ, কেহ পুরাণ কিল্লা ইত্যাদি নানা স্থানে প্রেরিত হইল। কিন্তু কোথায়ও কোন সূত্র পাওয়া গেল না।

একদিন হঠাৎ রাত্রি দুইটার সময় এক গুপ্তচর আসিয়া সাহেবকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তুলিল। সাহেব ধড়াচূড়া পরিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিলেন, আমিও সাহেবের পকেটে থাকিয়া অনেকটা উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

উভয়ের মধ্যে চুপি চুপি অনেক কথা হইল, আমি তাহার একবর্ণও শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু এইটুকু বুঝিলাম যে, কোথায় এক সোনারু আছে, সে কতকগুলি আফ্রিদি লোকের সঙ্গে অনেক সময় সোনা-রূপার গহনাপত্র কেনা-বেচা করে।

পরদিন প্রভাতেই একটি অনুচর লইয়া সাহেব সেই সোনারু কামারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তারপর তিনি প্রথমে সোনার দর জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে আংটি তৈয়ারীর মজুরী কত জিজ্ঞাসা করিয়া একটি আংটি দেখাইলেন এবং কহিলেন,—"এরই নমুনায় আর একটি আংটি গ'ড়ে দিতে হবে। কত শীগ্‌গির করতে পার বল।"

সোনারু কহিল—"তিন দিন লাগ্‌বে, এর কমে পার্‌ব না—হাতে কাজ আছে।"

সাহেব কহিলেন,—"বেশ তাই হবে। ঠিক একই মাপে, একই ওজনে হবে। সোনা তোমায় দিতে হবে, আমি তার দাম দেব ; এই নমুনা রাখ।"—বলিয়া সাহেব তাঁহার আংটিটি কামারকে দিলেন এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার মোটরগাড়ীতে চাপিয়া গাড়ী চালাইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি একবারও ভাবিলেন না যে, কি একটা সাংঘাতিক ভুল তিনি করিয়া গেলেন!

হাতের আংটির ওজন রাখা হইল না, কোন রসিদ গ্রহণ করা হইল না, তিনি ঝাঁ করিয়া একটা তৈয়ারী আংটি কামারের হাতে দিয়াই খালাস! কেবল তাহাই নহে, তিনি তাঁহার মানিব্যাগ্‌টি পর্য্যন্ত চেয়ারের উপর রাখিয়া গেলেন! তাঁহার সেই মানিব্যাগের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া গেলাম! ভাবিলাম, এ কি ব্যাপার! এত বড় একটা আহাম্মুকী কাজ এমন একজন বিচক্ষণ সাহেব কি করিতে পারেন! এ কি কখনও সম্ভব?

একবার সন্দেহ হইল, এমন অযাচিত ভাবে বিশ্বাস ঢালিয়া দেওয়া তাঁহার পুলিশী বুদ্ধির কোন কৌশল নহে তো?—অসম্ভব নহে; তাহা না হইলে কি এমন কতকগুলি মারাত্মক ভুল কেউ কখনও করে?

সোনারু-কামার—সে কখনও এমন আহাম্মক দেখে নাই।

সে ভাবিল, 'লোকটা এত আহাম্মক যে, নিজের মানিব্যাগ্‌টি পর্য্যন্ত ফেলে গেছে !'

বিস্ময়ে ও আনন্দে তাহার চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে মানিব্যাগ্‌টি খুলিয়া আমরা যে কয়টি টাকা-পয়সা ছিলাম, আমাদিগকে টানিয়া বাহির করিল। দেখা গেল, মোটের উপর তাহার দশ-বারো টাকা লাভ হইয়াছে।

সে ইচ্ছা করিলে সাহেবকে ডাকিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিত, তাঁহার সেই ভুলের কথা তাঁহাকে বলিতে পারিত; কিন্তু তাহা সে করিল না। তাহার অসাধু চরিত্র দেখিয়া আমার সমস্ত অন্তঃকরণ জ্বলিয়া উঠিল।

কামারটি টাকা-পয়সাগুলি হাতে লইয়া কয়েকবার নাড়া-চাড়া করিল। হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল আমার দিকে। সে আমাকে হাতে তুলিয়া লইল। বোধ হয় আমার কদর্য্য চেহারা, কালো রং তাহার একেবারেই মনঃপূত হইল না। সম্ভবতঃ সেজন্যই সে এমন একটা নিষ্ঠুর কাজ করিয়া ফেলিল যা' আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

সে তাহার সাঁড়াশী দিয়া আমাকে ধরিল, তারপর আমাকে তাহার সম্মুখে এক জ্বলন্ত চুল্লীর মধ্যে ঠেলিয়া দিল।

উঃ! সে কি যন্ত্রণা! আমার উপরে, নীচে, চারিদিকে জ্বলন্ত কয়লা টানিয়া সে আমাকে জ্যান্ত দগ্ধ করিতে লাগিল!

তবু হতভাগার আশা মিটিল না। সে আগুনটাকে

অধিকতর তীব্র করিবার জন্য একটা চোঙ্গা দিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে ফুঁ দিতে লাগিল। গন্‌গনে আগুনে আমার সমস্ত শরীর পুড়িয়া লাল হইয়া গেল, আমি আমার নীরব ভাষায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলাম। মৃত্যু আমার নাই—তাই মরিতে পারিলাম না।

কিন্তু সে-দিন বুঝিলাম, মরণ আমাদের কত বাঞ্ছিত, কত সুখের! মানুষ মরে—তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হয়,—

চোঙ্গা দিয়া ফুঁ দিতে লাগিল

কিন্তু আমি?—আমি মরিতে পারিলাম না—তিলে তিলে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম!

জানি না কেন;—লোকটা হঠাৎ আমাকে টানিয়া বাহির করিল, তারপর চক্ষুর পলকে সে আমাকে এক পাত্র ময়লা

জলে টুক্ করিয়া ফেলিয়া দিল। জ্বলন্ত আগুন হইতে জলে ফেলিতেই আমার সর্ব্বশরীর ছ্যাৎ করিয়া উঠিল, আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

লোকটা আমাকে জল হইতে টানিয়া তুলিল, তারপর কি-একটা শক্ত জিনিস দিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ বেশ করিয়া রগ্ড়াইতে লাগিল। ক্রমাগত ঘর্ষণে আমার গায়ের রং খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—আমার নিজের রূপ দেখিয়া আমি নিজেই চমকিত হইলাম।

লোকটা তারপর তাহার পাশেরই একটি বাটী হইতে এক টুক্‌রা উজ্জ্বল সোনা লইয়া সেটিকে আমারই পাশে রাখিয়া পাশাপাশি সাজাইয়া, আমাদের উভয়ের রূপ তুলনা করিতে লাগিল।—কেন যে এরূপ করিল বুঝিলাম না, শুধু দেখিলাম একটা মৃদু-মধুর হাসিতে তাহার মুখখানা ঝল্‌ঝলে হইয়া উঠিল।

আজ এতদিন পরেও স্বীকার করিতে লজ্জা হইতেছে যে, সে-দিন সোনার মত আমারও সেই সোনার কান্তি দেখিয়া আমি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই, এবং অহঙ্কারে আমার বুকটাও বুঝি একহাত ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

সোনারু যখন আমাদিগকে দেখিতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ী বাঁধা একটা লোক আসিয়া তাহাকে কহিল, —"কি দাদা! কি দেখ্‌ছ? কোন্ সোনার কত দাম, তাই পরখ কর্‌ছ, দাদা?"

"না ভাই, একটা অর্ডার পেয়েছি, একটা আংটি গ'ড়ে দিতে হবে তিন দিনের মধ্যে। জান ত ভাই, সোনার সঙ্গে তু'-একটু খাদ না মিশালে আমাদের চলে না। তাই দেখ্‌ছি এই তামার খাদ দিলে চল্‌বে কিনা। এটা অনেক দিনের পুরানো পয়সা—খাঁটি তামার তৈরী। আজকাল যা' সব পয়সা দেখ্‌ছ, সেগুলো এমন নিখুঁত তামার তৈরী নয়। কাজেই সোনার সঙ্গে মিশাতে হলে এই পয়সাটা খুব কাজে লাগ্‌বে।"—এই বলিয়া কামার আবার একটু হাসিল।

অপর লোকটি কহিল,—"তা' যাক্ ভাই! এখন একটা কাজের কথা বল্‌তে এসেছি, শোন। এখনই খেয়ে দেয়ে নাও, বেশী দেরী ক'রো না। একঘণ্টার ভিতর এক জায়গায় যেতে হবে। কতকগুলো দামী গয়না-পত্তর বিক্রী হবে। বেশ তু'দশ টাকা লাভ থাক্‌বে।—কি বল্‌ছ! যাবে তুমি?"

"হাঁ হাঁ, নিশ্চয়!"—বলিয়াই কামার উঠিয়া পড়িল। তারপর ঘরের সোনা-রূপা, গয়না-পত্তরগুলি জায়গামত গুছাইয়া রাখিল এবং সাহেবের টাকা-পয়সা ও মানিব্যাগের সঙ্গে আমাকে পকেটে পুরিয়া তখনই লাভের আশায় রওয়ানা হইল।

* * *

দিল্লীর উটের গাড়ী খট্ট-খট্ট শব্দে রাস্তা কাঁপাইয়া চলিয়াছে। তুই বন্ধু—সেই সোনারু কামার ও পাগ্‌ড়ীওয়ালা তাহাতে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে বলিতে যাইতেছিল।

উটের গাড়ীর খটাখট্ট ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত

হইতেছিল। হঠাৎ একটা প্রবল ঝাঁকুনীতে আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, বন্ধু দুইজনের কথাবার্ত্তাও বন্ধ হইয়া গেল।

ব্যাপার কি জানিবার জন্য দুইজনেই তাড়াতাড়ি ঘেরা ছই হইতে বাহিরে আসিল। আগে ছিল সোনারু কামার।

আসিয়াই দেখিল, তাহাদের উটের গাড়ী ও একটা গরুর গাড়ীতে ভীষণ সঙ্ঘর্ষ বাধাইয়া তুলিয়াছে। দুইখানা গাড়ী

উটের গাড়ী খট্-খট্ শব্দে রাস্তা কাঁপাইয়া চলিয়াছে

পাশাপাশি দুই বিপরীত দিকে যাইতেছিল; কিন্তু গাড়ী দুইখানা চলিতে চলিতে হঠাৎ একটির চাকা অপরটির চাকার সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া ভয়ানক কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছে—উটের গাড়ীর পেছনের চাকার সহিত গরুর গাড়ীর চাকা এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহা পৃথক্ করে কাহার সাধ্য!

সোনারু কামার ছুটিয়া ছইয়ের বাহিরে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁকুনীতে সে নিজের তাল সাম্‌লাইতে পারিল না—গাড়ী হইতে ছিট্‌কাইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেল; ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে উটের গাড়ীর চাকাটি গরুর গাড়ীর চাকা হইতে মুক্ত হইয়া হতভাগা সোনারুর পেটের উপর দিয়া চলিয়া গেল—তাহার প্রাণবায়ু তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

উটের গাড়ী ও গরুর গাড়ীর পরস্পর সঙ্ঘর্ষে,—গাড়োয়ানদিগের সামান্য অসাবধানতায় মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা মানুষ খুন হইয়া গেল!

"মার্-মার্" করিতে করিতে চারিদিক হইতে অসংখ্য লোক আসিয়া গাড়ী দুইখানিকে ঘিরিয়া ফেলিল।

তেমন সময়েও আমি না হাসিয়া পারি নাই। ভাবিলাম,—কি অদ্ভুত এই মানুষগুলি! ইহারা স্বার্থের জন্য পরস্পর খুনোখুনি করিতে পারে, আবার সামান্য উত্তেজনায় এমন সহানুভূতি-সম্পন্ন ভালমানুষ হইতে পারে যে, সহানুভূতির চরম আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এখন গাড়োয়ানদের মত অপর দুইটি মানুষ খুন করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছে না!

বনবনের হত্যাকারীর মত নিষ্ঠুর লোকও হয়ত ইহাদের মাঝে কত যে মিশিয়া আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কিন্তু তাহারাও এখন কত ভালমানুষ, সহানুভূতি-সম্পন্ন!—একটা আরোহী খুন হইয়াছে, বিনিময়ে গাড়োয়ান দুইটাকে খুন করিয়া প্রতিশোধের জন্য তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে!

আশ্চর্য্য বটে!—মানুষ জাতির বুদ্ধি অদ্ভুত! সহানুভূতি অদ্ভুত! আর তাহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধিও অদ্ভুত!

আঠার

মরিয়া রক্ষা পাইল সেই সোনারু কামার, কিন্তু বাঁচিয়া মরিল সেই পাগ্‌ড়ীওয়ালা!

তাহারা কেহই জানিত না যে, যখন হইতে তাহারা বাড়ীর বাহিরে পা বাড়াইয়াছিল, তখন হইতেই পুলিশ তাহাদের সঙ্গ লইয়াছিল।

উটের গাড়ী ও গরুর গাড়ীতে ঠোকাঠুকি হইবার পরেই হতভাগা সোনারু কামার তাহার শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চিরদিনের জন্য নিদ্রিত হইল,—তাহার পকেটের মানিব্যাগ, একটি ছুরি আর সব জিনিস রাস্তায় ছড়াইয়া পড়িল।

হুঁসিয়ার পাগ্‌ড়ীওয়ালা মুহূর্ত্তের সুযোগও নষ্ট হইতে দিল না; সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া সেই জিনিসগুলি কুড়াইয়া নিজের পকেটে পূরিল,—সুতরাং আমি সেই মানিব্যাগের সঙ্গে পাগ্‌ড়ীওয়ালার পকেটে আশ্রয় লাভ করিলাম।

তারপর—যেমন দুর্ঘটনায় যাহা হয়, তাহাই হইল। খুব হৈ-চৈ হইল, পুলিশ আসিল, অনেকের সাক্ষ্য লওয়া হইল, গাড়োয়ান ও গাড়ী দুইখানিকে থানায় পাঠানো হইল,

কামারের মৃতদেহ পুলিশের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। মোট কথা, মুহূর্ত্তের দুর্ঘটনায় বুঝি পৃথিবী ওলট্‌পালট্‌ হইয়া গেল!

মৃত লোকটি ছিল পাগ্‌ড়ীওয়ালার সহযাত্রী। সুতরাং পাগ্‌ড়ীওয়ালাকেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল।

পুলিশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—সে কোথায় যাইতেছিল এবং কেন যাইতেছিল? পুলিশের প্রশ্নে সে একেবারে ন্যাকা সাজিয়া বসিল। সে বলিল যে, সে একজন নবাগত লোক। দিল্লীতে দেখিবার মত জিনিসগুলি দেখাই তাহার উদ্দেশ্য। মৃত কামার তাহাকে এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করিতে পারিবে বলায় সে তাহার সহচর হইয়াছিল।

তাহার কথা শুনিয়া পুলিশ একটু মৃদু হাসিল মাত্র, কিন্তু কিছুই বলিল না। সে ভাবিল পাগ্‌ড়ীওয়ালার চরিত্রে হয়ত বিশেষ কিছু সন্দেহজনক নাই, কিন্তু পুলিশের ফ্যাসাদ এড়াইবার জন্যই সে এখন ন্যাকা সাজিয়াছে—এমন একটা মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিয়াছে! সুতরাং তাহার অনুসরণ করা সম্পূর্ণ বৃথা মনে করিয়া সে অন্যত্র প্রস্থান করিল।

পাগ্‌ড়ীওয়ালা পুলিশের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য তবু কিছুকাল সাবধানে থাকাই সঙ্গত বোধ করিল। সুতরাং সে যথার্থই নবাগত ব্যক্তির ন্যায় কয়েকদিন দিল্লীর নানা দর্শনীয় স্থান দেখিতে লাগিল, এবং বহু দর্শক ইহাতে তাহার সহযাত্রী হইল।

তাহারা প্রথমেই দেখিল—দিল্লীর দুর্গ। দুর্গমধ্যে অসংখ্য ধব্‌ধবে প্রাসাদ, মতি মস্‌জিদ ও সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেওয়ানী খাস্ এখনও মুসলমান সম্রাট্‌দিগের অতুলনীয় সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দিতেছে।

তারপর তাহারা দেখিল সব্‌দরজঙ্গ নামক স্মৃতিমন্দির ও হুমায়ুনের সমাধি। সব্‌দরজঙ্গ বীর সৈন্যাধ্যক্ষের স্মৃতিচিহ্ন।
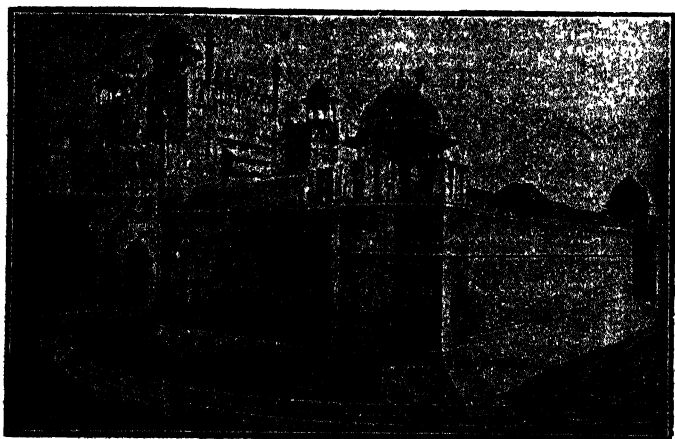
দুর্গ—লাহোর গেট

দুর্গের কাশ্মীর গেট্, লাহোর গেট্ প্রভৃতি ফটকগুলি দেখামাত্র আমার মনে হইল আবার সেই সিপাহী-বিদ্রোহের কথা।

সিপাহী-বিদ্রোহের সেই শোচনীয় ঘটনা সম্ভবতঃ ইংরেজ

জাতিও ভুলিতে পারে নাই। তাই, তাহার কথা চিরস্মরণীয় করিবার ব্যবস্থা স্থানে স্থানে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দুর্গের বাহিরে বিশাল জুম্মা মসৃজিদ। লাল পাথরে তৈয়ারী জুম্মা মসৃজিদ যেন ভক্ত মাত্রকেই তাহার সাধনার পথে উদ্দীপিত করিয়া তোলে।

একদিন পাগ্‌ড়ীওয়ালা জুম্মা মসৃজিদের মিনার হইতে দিল্লী সহরের দৃশ্য দেখিয়াছিল; সেই দৃশ্য বাস্তবিকই চমৎকার।

সবৃদরজঙ্গ
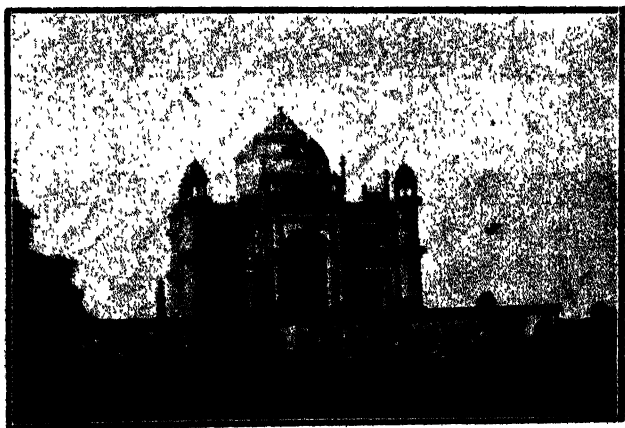
জুম্মা মসৃজিদের নিকটেই জৈন মন্দির। তাহার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দর্শক-মাত্রকেই মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

পাগ্‌ড়ীওয়ালা কিছুদিন ইতস্ততঃ ঘুরিয়া-ফিরিয়া অবশেষে আবার তাহার নিজ কাজে মনঃসংযোগ করিল। সে সস্তায়
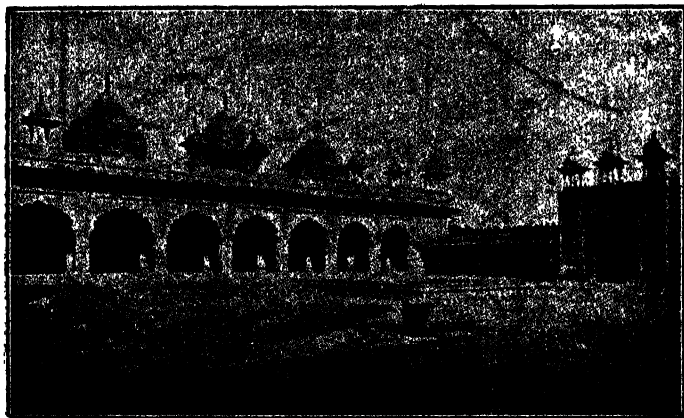
মতি মস্‌জিদ
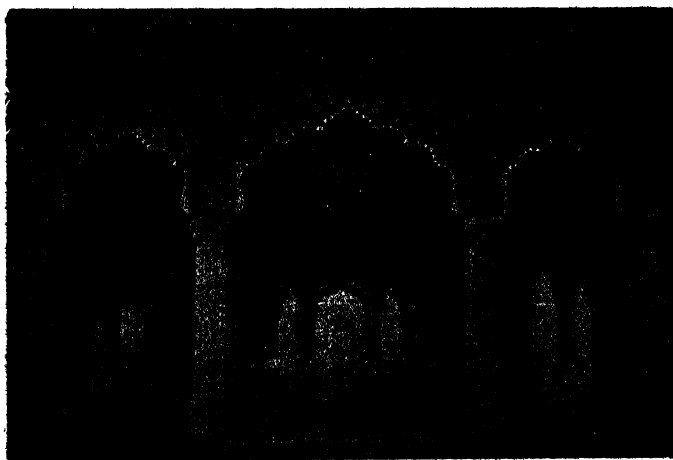
দেওয়ানী খাস্‌
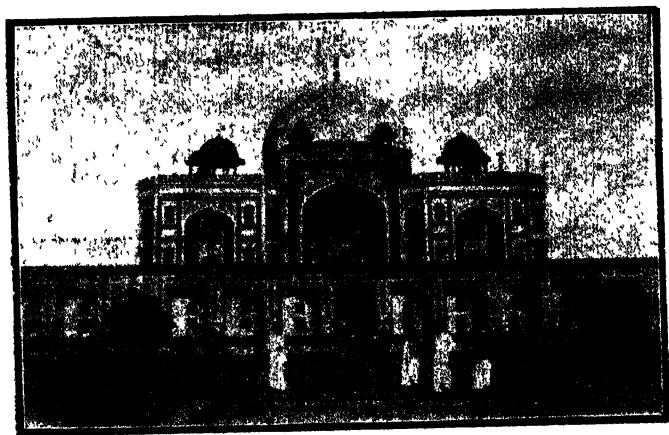
হুমায়ুনের সমাধি
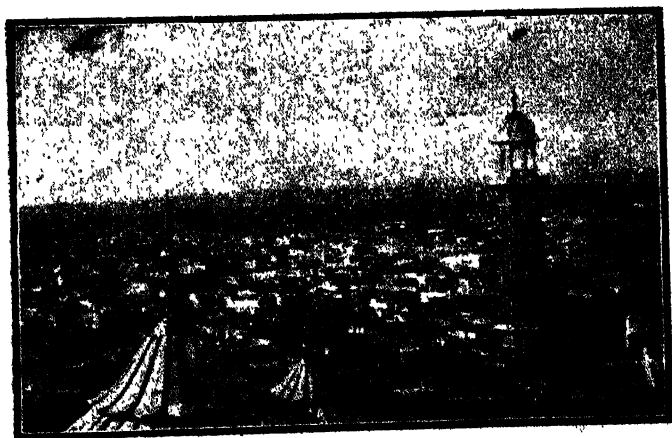
জুম্মা মস্‌জিদের মিনার হইতে দিল্লীর দৃশ্য

অলঙ্কার কিনিবার জন্য তাহার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানের অভিমুখে রওয়ানা হইল। তাহার সঙ্গে আসিতে প্রথমেই আমার দৃষ্টিপথে পড়িল—পৃথ্বীরাজের কেল্লার ধ্বংসাবশেষ।

পৃথ্বীরাজ শেষ হিন্দু নৃপতি। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর
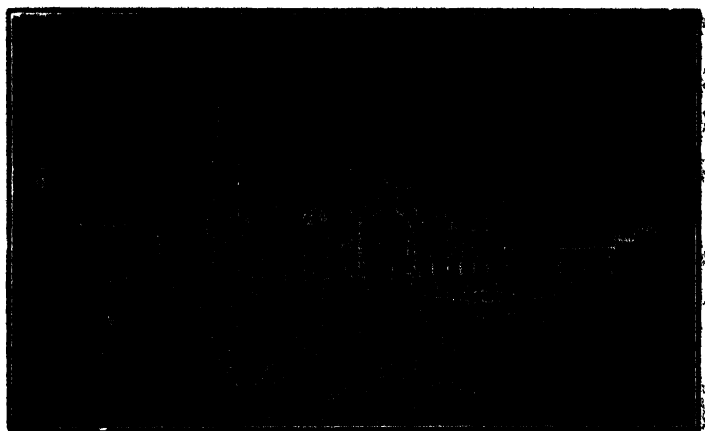
জুম্মা মসজিদ

হস্তে থানেশ্বরের যুদ্ধে তাঁহার ও তাঁহার রাজধানীর পতন হয় এবং সেই সময় হইতেই ভারতে মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হয়।

পাগড়ীওয়ালা সেখানে যাইতেই কোন একটা ধ্বংসস্তূপ বা ঝোপের আড়াল হইতে এক ভদ্র-বেশধারী আফ্রিদি যুবক তাহার সম্মুখে আসিয়া সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল। পাগড়ী-ওয়ালাও একটু মুচকি হাসিয়া তাহাকে কি কতকগুলি কথা

বলিল, তারপর উভয়ে একসঙ্গে চলিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, তুইজনেই একই পথের পথিক।

ইহার পরে আমরা প্রথমে যে স্থানে আসিলাম, তাহার নাম 'জাহান পান্না'। তাহার পরে যেখানে আসিলাম তাহার নাম 'সিরি'। এই 'সিরি' নগরের স্থষ্টিকর্ত্তা আলাউদ্দিন খিল্‌জি। ১২৯৬ হইতে ১৩১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের সর্ব্ব-উত্তর প্রদেশকে তিনি 'সিরি' নামে অভিহিত করেন।

আলাউদ্দিন খিল্‌জির দশ বৎসর পরে ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে, সম্রাট্ গিয়াসুদ্দিনের পুত্র মহম্মদ তোগ্‌লক্ ঐ সিরিকে দিল্লীর অন্তর্গত অন্যতম নগর কুতুবের সহিত একত্র করেন এবং কুতুব ও সিরির মধ্যস্থলকে 'জাহান পান্না' নামে অভিহিত করেন।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সিরিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য মহম্মদ তোগ্‌লক্ তাহার চারিপাশে যে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এখনও তাহার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ প্রাচীর-শ্রেণীর বিশেষ একটি স্থানে—একটি কুঠরীর দরজার সম্মুখে আসিয়া পাগ্‌ড়ীওয়ালা উচ্চকণ্ঠে ডাকিল,—"জান্ মহম্মদ!"

তুই-তিনবার ডাকিতেই একটি পেশোয়ারী মুসলমান ঘরের ভিতর হইতে উঁকি দিয়া বাহিরে তাকাইল; পরক্ষণেই সে ঘরে ঢুকিল এবং অপর একটি লোককে সঙ্গে করিয়া আবার সেই মুহূর্ত্তেই বাহির হইল।

উভয় দলে দেখা হইলে, পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিল। তারপর নূতন লোকটি পাগ্‌ড়ীওয়ালাকে কহিল,—"কি খবর? টাকা নিয়ে এসেছ?"

"হাঁ", বলিয়া পাগ্‌ড়ীওয়ালা উত্তর করিল।

"আচ্ছা, চল তবে" বলিয়া সেই নূতন লোকটি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। পাগ্‌ড়ীওয়ালা ও তাহার সঙ্গী ঐ লোকটির অনুসরণ করিল।

তাহারা এইবার তোগ্‌লকাবাদের রাস্তা ধরিল। সিরি হইতে তোগ্‌লকাবাদ নিতান্ত কম দূর নহে। গিয়াসুদ্দিন তোগ্‌লকের রাজত্বকালে তোগ্‌লকাবাদ সমৃদ্ধির উচ্চস্তরে ছিল। শত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য তিনি তৎকালীন নগরী হইতে প্রায় পাঁচ মাইল পূর্ব্বে তোগ্‌লকাবাদ নাম দিয়া এক সহর স্থাপন করেন ও তথায় এক বিশাল দুর্গ নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু তোগ্‌লকাবাদের সমৃদ্ধি বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। কেহ বলেন, জলবায়ু খারাপ—ইহাই মূল কারণ। আবার কেহ বলেন, বিখ্যাত সাধু নিজামুদ্দিনের অভিশাপই ইহার কারণ।

সম্রাটের দুর্গ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে সাধু নিজামুদ্দিনের পুষ্করিণী-কাটা বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। ইহাতে তিনি অভিসম্পাত করিয়াছিলেন,—"এখানে কেবল শকুনী-গৃধিনীর বাস হইবে।" কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে। তোগ্‌লকাবাদ অল্প দিন মধ্যেই

পরিত্যক্ত সহরে পরিণত হইল। চোর-ডাকাত, গুণ্ডা-বদ্‌মায়েসই তোগ্‌লকাবাদের প্রধান অধিবাসী হইয়া উঠিল।

পথশ্রমে পাগ্‌ড়ীওয়ালা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। সে বার বারই জিজ্ঞাসা করিতেছিল,—"আর কতদূর?" আর জান্‌ মহম্মদ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছিল, "এই যে—প্রায় এসে পড়েছি। বেশী দূর নয়।"

যাহোক্‌ বহুক্ষণ পরে তাহারা অবশেষে তোগ্‌লকাবাদ দুর্গ প্রাচীরের কাছে উপস্থিত হইল। দুর্গের নিকটেই গিয়াসুদ্দিন তোগ্‌লকের কবর প্রাচীর-ঘেরা অবস্থায় এখনও দেখিতে পাইলাম। দুর্গ-প্রাচীরের মূলদেশে উপস্থিত হইয়া জান্‌ মহম্মদ কহিল,—"এই,—এই দুর্গের ভিতর যেতে হবে।"

দুর্গের একটা ফাটলের কাছে যাইয়া জান্‌ মহম্মদ তাহার মুখের ভিতর আঙ্গুল ঢুকাইয়া বেশ জোরে একবার শিসের আওয়াজ করিল।

কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন আর একবার শিস্‌—তারপর আবার শিস্‌!

এইবার শিসের পরক্ষণেই রোগা একটি লোক বাহির হইয়া আসিল এবং একবার জান্‌ মহম্মদের দিকে, ও আর একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল; তারপর জান্‌ মহম্মদের দিকে তাকাইয়া ভদ্রভাবে কহিল,—"আসুন, বাবা অসুস্থ, ভিতরে আছেন।"

জান্‌ মহম্মদ সঙ্গী দুইজনকে লইয়া সেই ফাটলের পথে

অগ্রসর হইল। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পাগ্‌ড়ী-ওয়ালা তাহার জুতার ফিতা আঁটিয়া বাঁধিবার ছলে একবার সকলের পেছনে হটিল, এবং সেই মুহূর্ত্তের সুযোগে তাহার কোমরের নোটের তাড়াগুলি বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লইল, ও তাহার বুক-পকেট হইতে মানিব্যাগটি বাহির করিয়া সেইটিকে গোপনে ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

আমার বোধ হইল, পাগ্‌ড়ীওয়ালা নিশ্চয়ই ভয় পাইয়াছে। তাই, তাহার সমস্ত সম্বল দুর্গমধ্যে লইয়া যাইতে সাহস পাইল না,—সে তাহার কিছু টাকাকড়ি দুর্গের বাহিরেই রাখিয়া গেল।

বলা বাহুল্য, মানিব্যাগের সঙ্গে আমিও দুর্গের বাহিরেই পড়িয়া রহিলাম—হতভাগ্য পাগ্‌ড়ীওয়ালার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য ঘুচিয়া গেল।

সম্ভবতঃ সে আর বাঁচিয়া নাই। বাঁচিয়া থাকিলে সে নিশ্চয়ই তাহার ত্যক্ত ধন-সম্পত্তি উদ্ধার করিতে আসিত।

হতভাগা সেই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার দুইদিন পরেই দিল্লীর পুলিশ সেখানে আসিয়া যে একটা বিরাট অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাতে স্বভাবতঃই ধারণা হয় হতভাগার যথার্থই কোন অমঙ্গল হইয়া থাকিবে,—তাই দিল্লী পুলিশের অত দরদ, অত মাথাব্যথা।

যাহোক্, জানি না কাহার অভিশাপে আবার আমার দুঃখের জীবন আরম্ভ হইল।

আসামের চা-বাগানে সুদীর্ঘ কত বৎসর আমাকে নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে, আজও আবার সেই নিঃসঙ্গ জীবনই অতিবাহিত করিতেছি। তবু মনে হইল, আমার বর্ত্তমান জীবন অপেক্ষা বুঝি বা সেই চা-বাগানের জীবনও ছিল কত সুখের! সেখানে ছিল কেবল বন-জঙ্গলের স্বাভাবিক ভীতি—এখানে তদুপরি আরও একটি ভীতি তীব্র-ভাবে অনুভব করিতেছি;—প্রত্যহ গভীর নিশীথে আমি যেন নানা রকম বিভীষিকা বা ভৌতিক কাণ্ড দেখিতে পাই।

কিন্তু—কে আমাকে উদ্ধার করিবে?—

মনে পড়ে, শুধু একবার—এক সাধু ফকীর আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া—আদর করিয়া—হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য! চির-দারিদ্র্য-ব্রতী ফকীর টাকাপয়সা লইয়া কি করিবেন? কাজেই তৎক্ষণাৎ গভীর উপেক্ষায় আবার আমাদিগকে তেমনই ভাবে সেখানে ফেলিয়া গিয়াছেন!

ফকীরকে কত মিনতি করিলাম—কিন্তু সবই বৃথা হইল! তিনি নিজে আমাদিগকে পুনরায় স্পর্শ করিতে ঘৃণাবোধ করিলেন! কেবল এইটুকু মাত্র অনুগ্রহ করিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন যে, আমার সারা জীবনের দুঃখময় কাহিনীর সুস্পষ্ট চিত্র বাংলার কোন নগণ্য লেখকের সামান্য লেখনীতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

—ভরসা আছে, বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদিগের কোন

অনুসন্ধিৎসু ও দয়ার্দ্র ব্যক্তি হয়ত কোন দিন আমার উদ্ধার সাধন করিবেন।

কোন্ সুদূর অতীতে আমার ভারত-ভ্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল! সেই অসমাপ্ত জীবন উদ্‌যাপনে—অতীত কীর্ত্তি-কাহিনী-পরিপূর্ণ ভারত-ভ্রমণে আবার কে আমাকে সাহায্য করিবেন?